মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৮

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

সেপ্টেম্বর ২০১৪ইং, জিলকাদ ১৪৩৫হি:,ভাদ্র ১৪২১বাং
ذوه القعده ١٤٣٥ ستمبر ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ৭
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ : হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ ও তার নিরসন..... ১১
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
হজ ও উমরা তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল..... ১৯
মুফতী শাহেদ রহমানী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৮..... ৩৪
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
তাবলীগি কাজের সূচনা-৬..... ৩৯
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৫.... ৪২
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৪ ..... ৪৩
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৫

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

‘মতভেদ’ যেন ‘সংঘাত’-এ রূপ না নেয়

মতভেদ, মতানৈক্য–এসব মানুষের প্রাকৃতিক বিষয়। আল্লাহ তা’আলা মানুষের সৃষ্টিতেই এরূপ উপকরণ নিহিত রেখেছেন। শুধু মানুষ কেন, সারা পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই এরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু ইসলামের দাবি হলো, প্রাকৃতিকভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, বক্তব্য ও গবেষণার এই ভিন্নতার মধ্য দিয়েও তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। পরস্পরের প্রতি সীমালঙ্ঘন করবে না। সকল মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে। মতভেদকে তারা ফিতনায় পরিণত করবে না।

সুতরাং মুসলমানদের ঐক্যের এই অর্থ নয় যে, তাদের মধ্যে কোনো প্রকার মতদ্বৈততা ও মতভেদ থাকতে পারবে না। মতের ভিন্নতা ইসলামের প্রারম্ভকালেও ছিল, এখনো থাকবে। বরং তা বিদ্যমান থাকার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, মতামত বা গবেষণার ভিন্নতা ঐক্যের পরিপন্থীও নয়, আবার পরস্পর সম্মান ও ভ্রাতৃত্ববোধেরও পরিপন্থী নয়। যদি এই মতানৈক্যকে ঐক্যেরই পরিপন্থী বা পরস্পর মর্যাদাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিপন্থী মনে করা হয়, তা হবে সম্পূর্ণ গোমরাহী।

মতভেদ আর ফেরকা সৃষ্টি এক কথা নয়। দ্বীনের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতভেদ ছিল। তাবেঈন, তাবেতাবেঈন তথা সলফে সালেহীনের মধ্যেও মতভেদ ছিল। সেগুলো ফেরকা নয়। বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে বিকৃতি ও সংযোজন-বিয়োজন করে ফিতনা সৃষ্টির নামই ফেরকা। এরূপ ফেরকা সৃষ্টি করাই ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য ফিতনা ও সংঘাতের কারণ।

ইসলামে সাহাবায়ে কেরামের যুগেই এরূপ ফেরকা সৃষ্টির ধারা আরম্ভ হয়। যেগুলোর ওপর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন একটি দল বের হয়, যাদের দাবি ছিল কোনো মুসলমান কবীরা গোনাহে লিপ্ত হলে সে কাফের হয়ে যাবে। তার ওপর কাফেরের মতোই শরয়ী হুকুম প্রয়োগ করা হবে। আবার কিছু লোক বের হয় যারা বলে, ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। বাকি কোনো আমল তার ওপর প্রভাব ফেলবে না। কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাণ্ড ঘটায়। যারা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে কাফের পর্যন্ত বলে ইত্যাদি। এ ধরনের মৌলিক বিষয় নিয়ে যারা মুসলমানদের মাঝে ফিতনা করেছে বা করতে চেয়েছে, তাদেরকেই ফেরকাবাজ বলা হয়েছে। এরূপ ফেরকার মাধ্যমেই মূলত মুসলমানদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এসব বিধর্মীর প্ররোচনার মাধ্যমে হোক বা নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য কোনোটির অবকাশ ইসলামে নেই।

মুসলমানদের সতর্ক থাকার বিষয় এটিই। কোথাও কোনো ফেরকা সৃষ্টি হচ্ছে কি না। যেকোনো নতুন চিন্তাধারার আগমণ ঘটবে তখনই মুসলমানদের চিন্তা করতে হবে এটি কি নিছক মতভেদ, নাকি ফেরকা।

মতভেদ কি ফেরকা, তা চেনার উপায় দুভাবে হতে পারে। প্রথমত, ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে সৃষ্ট কোনো ফেরকার চিন্তা-চেতনা ও আকীদা বিশ্বাসের সাথে সদ্য আগত কোনো চিন্তা-চেতনার মিল থাকছে কি না। দ্বিতীয়ত, তাদের আমল-আখলাকের রং-রূপ সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনের সাথে মিলে কি না। এ দুটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারলেই মতভেদ আর ফেরকা পরিচয় করতে সহজ হয়ে যায়।

ধরুন, দেখা গেল কিছু লোক বাহ্যিকভাবে দেখতে-শুনতে খুবই ভালো। আচার-আচরণ ভালো, কথাবার্তাও সুন্দর। সব সময় কুরআন-হাদীসের কথা বলে। সব সময় ‘সহীহ শুদ্ধ’ ছাড়া চলে না। অথচ তাদের আকীদার মধ্যে আছে কবীরা ‘গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।’ সে কারণে যত সব লোক কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে, তাদের ওপর মুরতাদের হুকুম চলবে। এরূপ আকীদা তারা সরাসরি বলুক বা তাদের আচরণ থেকে প্রকাশ হোক, সবই সমান। এরূপ চিন্তা-চেতনা যারা রাখবে নিঃসন্দেহে বলা যাবে এটি ওই ফেরকার চিন্তা-চেতনায় লালিত, যাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের যুগে খারেজী বলা হতো।

তেমনি কারো মধ্যে যদি দেখা যায় সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিদ্বেষ রয়েছে। সলফে সালেহীন সম্পর্কে বিদ্বেষ রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঠিক পন্থার ওপর পুরোপুরি তারা সন্তুষ্ট নয়। এদের সম্পর্কে ধারণা করা যাবে শীয়াদের কিছু কিছু চিন্তা-চেতনা তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যে শিয়া ইসলামের প্রারম্ভ যুগ থেকে একটি ফেরকা বলে স্বীকৃত।

ফেরকা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি হলো, তাদের ব্যাপারে সকল মুসলমানকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে নিজেও যেন সে ফেতনায় পতিত না হয়। উলামায়ে কেরামের কাজ হলো, মুসলমানদেরকে দাওয়াতী পদ্ধতিতে সচেতন করা। তবে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে সংঘাত যেন না হয়। বরং ওদের পক্ষ থেকে এমন এমন কাজ করা হতে পারে, যাতে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায়। তথাপি মুসলমানদের এদের সে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
৩১/০৮/২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করো...। (সূরা মায়েদা ৩৫)

وسيلة শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س،ص উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وصل এর অর্থ যে কোনো রূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وسل এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা। (সিহাহ, জওহরী, মুফরাদাতুল কুরআন) তাই وصلة ও وصيلة ওই বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে। তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে। পক্ষান্তরে وسيلة ওই বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। (লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল কুরআন)। وسيلة শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ওই বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وسيلة শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকীমের বর্ণনা মতে, হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন, ওসীলা শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর, হযরত আতা (রা.), মুজাহিদ (রহ.) ও হাসান বসরী (রহ.) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লহ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ করো।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম ওসীলা। এর ঊর্ধ্বে কোনো স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করো, যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন তোমরাও তাই বলো। এরপর দরূদ পাঠ করো এবং আমার জন্য ওসীলার দু'আ করো।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর। যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যত এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, হিদায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে। তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ (সা.) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর মকতুবাত গ্রন্থে এবং কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা শব্দটিতে প্রেম ও আবেগের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, মুমিনের পক্ষে ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের ওপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা।

কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, فاتبعونى يحببكم الله "আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। তাই ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নতের যত বেশি অনুসরণ করবে, আল্লাহর মুহব্বত সে তত বেশি অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও তত বেশি অর্জিত হবে।"

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের তাফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তা মানুষের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। কেননা এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদের ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দু'আ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুল করেছিলেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং জনৈক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দু'আ করতে বলেছিলেন, اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة আল্লাহ, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। (মানার)

(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ও ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

হজ ও উমরার ফজীলত

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ করল এবং এতে কোনো অশ্লীল কাজ ও নাফরমানী করল না, সে হজ থেকে ওই দিনের মতো আবিলতামুক্ত হয়ে ফিরে আসবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একটি উমরা থেকে অপর উমরা এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহর কাফফারাস্বরূপ। আর পুণ্যময় হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

عن ابن مسعودؓ قال قال رسول الله ﷺ تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة۔

৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা হজ ও উমরা এক সাথে সাথে করো। কেননা এ দু'টি জিনিস দারিদ্র্য ও গুনাহকে এভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে হাঁপর লোহা ও সোনা-রুপার ময়লা দূর করে দেয়। আর পুণ্যময় হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। (তিরমিযী, নাসাঈ)

عن ابى هريرةؓ عن النبى ﷺ انه قال الحاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفرلهم۔ (رواه ابن ماجه)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান। তারা যদি আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তাহলে তিনি তা কবুল করেন, আর যদি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ)

عن عبد الله بن عمرؓ قال قال رسول الله ﷺ اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفرلك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له (رواه احمد)

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোনো হাজীর সাথে সাক্ষাৎ করো, তখন সে তার বাড়িতে পৌঁছার আগেই তাকে সালাম দাও, তার সাথে মুসাফাহা করো এবং তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করো। কেননা তার ক্ষমার ফায়সালা হয়ে গেছে। (তাই তার দু'আ কবুল হওয়ার প্রবল আশা করা যায়।) (মুসনাদে আহমদ)

عن ابى هريرةؓ من خرج حاجا او معتمرا او غازيا ثم مات فى طريقه كتب الله له اجر الغازى والحاج والمعتمر۔

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হজ, উমরা অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হলো, তারপর রাস্তায়ই মারা গেল, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুজাহিদ, হাজী ও উমরাকারীর জন্য নির্ধারিত সওয়াবই দান করবেন। (বায়হাকী)

جاء فى حديث طويل ان النبى ﷺ قال لعمرو بن العاصؓ اما علمت ان الاسلام يهدم ماقبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وان الحج يهدم ما قبله۔

একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমর ইবনুল আস (রা.)-কে বলেন, তুমি কি জানো, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়, হিজরত করার মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আর হজ করার দ্বারাও তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

সংশোধনী

বিগত রমাজান ১৪৩৫ হি., জুলাই ১৪ সংখ্যার দরসে ফিকহে পৃ.৬ এর ১ম কলামে বি. দ্র.-এ লেখা হয়েছিল–

নিসাব পরিমাণ মাল বছরের শুরু এবং শেষে বিদ্যমান থাকা শর্ত। মধ্যবর্তী সময়ে সম্পদের পরিমাণ কমে গেলে বা সমুদয় মাল হাতছাড়া হয়ে গেলে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার নিসাব পরিমাণ মাল হস্তগত হলে যাকাত দিতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে' ২/৫১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫৫)

এখানে দুটি বিষয়। ১। সম্পদের পরিমাণ কমে যাওয়া। ২। সমুদয় মাল হাতছাড়া হওয়া। অসতর্কতাবশতঃ উভয়টির বিধান একই লেখা হয়েছে। মূলত উভয়টির বিধান ভিন্ন হবে।

যথা : ১। সম্পদের পরিমাণ কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে বছর শেষের পূর্বে পুনরায় নেসাবের মালিক হলে যাকাত দিতে হবে। ২। সমুদয় মাল হাতছাড়া হওয়ার ক্ষেত্রে পুনরায় নেসাবের মালিক হলে সেখান থেকে পুনঃ যাকাতবর্ষ শুরু হবে।

বিষয়টির প্রতি যে সকল সুহৃদ পাঠক দৃষ্টিআকর্ষণ করেছেন আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। *সম্পাদনা পরিষদ*

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

কাজের মধ্যেই সফলতা :
দীর্ঘদিন থেকে পরিবর্তিত অভ্যাস সংশোধনের জন্য চেষ্টা ফিকির করতে হবে। আবার এ চেষ্টা কুশিশ ধারাবাহিক করা উচিত। তার পরে কাজ হবে। শুধু মনে মনে চিন্তা ও দূরাশা করলে কাজ হবে না। (একটি ফেস্টুনে অতি চমৎকারভাবে ‘ دار الشفاء লেখা ছিল) সে দিকে ইশারা করে হযরত বলেন, কেউ চিন্তা করল আমি এভাবে ‘د’ বর্ণ অঙ্কন করব। তাতে কিন্তু ‘د’ অঙ্কন হয়ে যাবে না। বরং এরূপ সুন্দর লেখার প্রশিক্ষণ নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। তার পরেই একসময় সেরূপ লেখার যোগ্য হয়ে উঠবে এবং লেখতে পারবে। তেমনি যেসব কুঅভ্যাস আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে তা পরিবর্তনের জন্য আমাদের চিন্তাও প্রয়োজন চেষ্টা কুশিশও প্রয়োজন। তখন আল্লাহ তা’আলা কামিয়াবী ও সফলতা দান করবেন।

অশিষ্টরা আল্লাহ তা’আলার রহমত থেকে মাহরূম হয় :
উস্তাদের সাথে ইজ্জত ও আদবের সাথে আচরণ করা প্রয়োজন। অন্তরে তাদের ইজ্জত, মুহাব্বত, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকতে হবে। যে লোক উস্তাদের সাথে বেআদবী ও অশিষ্ট আচরণ করবে সে ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। যদি সে পড়ালেখা শেষও করে কিন্তু সে পড়ালেখার বরকত থেকে মাহরূম হয়ে যায়। যদি হিফজ শেষ করে নেয় তবে তার হিফজে বরকত হয় না। যেমন একটি পাইপলাইন, যা থেকে মানুষ পরিষ্কার পানি আহরণ করে। কেউ যদি তার মাঝে কিছু কাদামাটি বা ময়লা ঢুকিয়ে দেয় তবে তা দিয়ে পরিষ্কার পানি আসবে না। বরং পানি নষ্ট ও নাপাক হয়ে যাবে। তেমনি উস্তাদের অন্তর ব্যথিত করলে তাঁর ফয়জ বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি বড়ই স্পর্শকাতর এবং ভয়াবহ।

উস্তাদকে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করো :
উস্তাদের যত বেশি সম্মান ও ইজ্জত করা হবে এবং যত বেশি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অন্তরে রাখবে ইলমে তত বেশি বরকত হবে। উস্তাদের আদেশ-নিষেধ ও তত্ত্বাবধানের উপমা হলো কোনো লোকের চোখ আছে, চোখে দেখার শক্তিও আছে। কিন্তু চোখে ছানি পড়ার কারণে সে দেখছে না। ডাক্তার যখন অপারেশন করে উক্ত ছানি পরিষ্কার করে দেয়, তখন চোখে দৃষ্টিশক্তি পুনারগমন করে, চোখ আগের মতোই দেখার যোগ্য হয়ে ওঠে। তেমনি ছাত্রদের মধ্যে ইস্তি’দাদ ও যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। সে যোগ্যতা, মেধা প্রকাশ ও কাজে লাগানোর প্রয়োজন হয়। তাই উস্তাদ এই মেধা ও যোগ্যতা প্রকাশ করতে পারার জন্য ছাত্রদের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বেঁধে দেয়, বিভিন্ন উপদেশ দেয়। অনেক সময় এরূপ উপদেশ অনেক মামুলি আকারেই হয়ে থাকে। কিন্তু বড়ই উপকারী হয়। এই উপদেশের ওপর আমল করার কারণে মেধা ও যোগ্যতা খুবই বিকশিত হয়। তাই উস্তাদকে হিতাকাঙ্খী মনে করা আবশ্যক।

গুনাহ হলে তাওবা করা আবশ্যক :
মানুষ যখন একবার ভুল করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তৎক্ষণাৎ তাওবা করে তা আবার পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি তাওবা না করে এবং আবার গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন প্রত্যেক গুনাহের কারণে একেকটি কালো চিহ্ন তার অন্তরে পড়ে। যার কারণে মানুষের অন্তর নষ্ট হয়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

ان المومن اذا اذنب كان نكتة سوداء فى قلبه فان تاب واستغفر صقل قلبه وان زادت حتى تعلوقلبه۔

“মুমিন যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এর ওপর তাওবা-ইস্তিগফার করলে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি গুনাহ করতেই থাকে তখন ওই কালো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কালো দাগে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (মিশকাত ১/২০৪)

তখন এর ফলাফল জাহির হতে থাকে। অন্তরে অস্থিরতা, বেচাইনি এবং পেরেশানির শেষ থাকে না। ভালো ও নেক কাজ করতে মনে চায় না। সুতরাং কারো যদি পড়ায় মন না বসে এবং অন্তরে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা থাকে তখন চিন্তা করা দরকার,

কোনো প্রকার গুনাহ সংগঠিত হয়েছে কি না। বা কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ও অনিয়ম হয়েছে কি না। যদি সেরূপ দেখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাওবা-ইস্তিগফার করা উচিত।

দ্বীনের খাদেম এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ :

অনেক সময় বলা হয় সাধারণ লোকদের কাছে দ্বীনের খাদেম তথা উলামায়ে কেরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। কথা হলো নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আকৃতি-প্রকৃতি যখন সাধারণ লোকদের মতোই হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে আচরণও সাধারণ লোকদের মতো হবে। একজন প্রশাসনিক লোক যদি তার নিজের পোশাকে থাকে তখন তাঁর সাথে আচরণও সেরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু একজন অফিসার যদি সাধারণ পোশাক পরে পানের দোকানে সাধারণ লোকের মতো আসে তখন তার সাথে আচরণও সাধারণ লোকদের মতো করা হয়। তার বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে না। বরং সকলের ন্যায় লাইনেই দাঁড়াতে হয়। কিন্তু তিনি যখন নিজের প্রকৃত পোশাকে আসবেন তখন তাঁর সাথে আচরণও অফিসারসুলভ করা হবে। পোশাক-পরিচ্ছদের বড়ই প্রভাব আছে।

একদা শহরের নিকটবর্তী ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেওয়ার জন্য একজন আলেম তাশরীফ আনলেন। তাঁর সাথে একজন মাস্টার সাহেবও ছিলেন। ওয়ায়েযের লেবাস পোশাক ছিল সাধারণ। আর মাস্টার সাহেবের লেবাস পোশাক ছিল বুযুর্গ ও আল্লাহ ওয়ালাদের মতো। তাঁরা উভয়ে মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার পর মাস্টার সাহেবের সাথে মোসাফাহা ও সাক্ষাতের জন্য মানুষ ভিড় জমাতে লাগল। মানুষ মনে করল তিনিই এই মাহফিলের বক্তা। এটি হলো পোশাক-পরিচ্ছদের প্রভাব।

আমি একসময় বাগদাদ গেলাম। আমার দ্বীনি ভাই ডা. মাহমুদ শাহ (রহ.) এক লোকের কাছে আমাকে নিয়ে গেল এবং পরিচয় তুলে ধরতে লাগল। তখন ওই লোক বললেন, পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-প্রকৃতি ও চেহরাই তাঁর পরিচয় বহন করে।

আজ মাদরাসার উস্তাদ এবং ছাত্র, কর্মচারী প্রমুখের পরিচয় তুলে ধরতে হয়। তিনি ওই মাদরাসার শিক্ষক, ওই মাদরাসার শায়খুত তাফসীর। সে ওই মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র ইত্যাদি। এরূপ পরিচয় তুলে ধরতে হবে কেন? কারণ হলো আমরা সুলাহা ও আল্লাহ ওয়ালাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করেছি। সুতরাং আমাদের সাথে আচরণও সাধারণ লোকদের ন্যায় হবে। তাই আল্লাহ ওয়ালাদের মতোই পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতি তাদের মতোই হতে হবে। তবেই মানুষ আমাদের সাথে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করবে।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

(গত ১৪ শাওয়াল সোমবার মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা ১৪৩৫ ও ৩৬ হি. শিক্ষাবর্ষ উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সবক প্রদান মাহফিলে প্রদত্ত হযরত ফকীহুল মিল্লাত দামাত বারাকাতুহুমের গুরুত্বপূর্ণ বয়ান।)

পবিত্র কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শেষে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) চলতি দরসী সালের প্রথম সবক প্রদান করেন। অতঃপর হামদ-ছানা পড়ে সকলের উদ্দেশে ইলমের প্রকারভেদ, গুরুত্ব, মারকাযের মৌলিক কানুন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন–

১. ইলমের প্রকার :

দ্বীনি ইলম দুই প্রকার- ক. উলুমে মকসুদা। খ. উলুমে গাইরে মকসুদা। অর্থাৎ প্রথম প্রকারের ইলম শিখার উপায়-উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন- ইলমে ছরফ, ইলমে আদব, ইলমে নাহু, ইলমে বালাগাত, ইলমে মানতেক, ইলমে ফালসাফা ইত্যাদি। এসব ইলম মূল ইলমের উপকরণ ও মাধ্যম হিসেবেই শিক্ষা লাভ করা হয়। কেউ এসব ইলমকে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নিতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো গুরুত্বহীন, অর্থহীন। আমি বলতে চাই এসব ইলম শিক্ষা লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে উলুমে মকসুদার স্বার্থে। যেমন ওযু করা হয় নামাযের জন্য। ওজু ছাড়া যেমন নামায শুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তদ্রূপ উলুমে গাইরে মকসুদা শিখা ছাড়া উলুমে মকসুদা শিখার ও এর ধারক-বাহক হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। বোঝা গেল, উলুমে মকসুদা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো, উলুমে গাইরে মকসুদার শিক্ষা লাভ করা। আফসোসের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে এসব বিষয়ে শিক্ষার মান তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। আবার কতক বিষয় এমন আছে, যেগুলোকে নিসাব থেকে কেটে-ছেঁটে ফেলে দেয়া হয়েছে। যেমন, মানতেক, ফালসাফা। আর আদবের নাম শোনা গেলেও প্রকৃত বালাগাত-ফাসাহাতের নাম-গন্ধ আছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পরিণামে উলুমে মকসুদার পালা আসলে অধিকাংশ তালেবে ইলমকে আনকোরা-আনাড়ি এবং অকল্পনীয় দুর্বল পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্ন হলো, এর দায়দায়িত্ব কে বহন করবে?

উলুমে মকসুদা :

উলুমে মকসুদা অর্থাৎ যে ইলম অর্জনের অভিষ্ট লক্ষ্যে একজন তালেবে ইলম কষ্ট-ক্লেশ, ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে থাকে। এই ইলম তিন ভাগে বিভক্ত :

ক. উলূমুল কুরআন

খ. উলূমুল হাদীস

গ. ইলমুল ফিক্বহ।

উলূমুল কুরআন :

উলূমুল কুরআন দুই ভাগে বিভক্ত।

১. অক্ষর ও শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কুরআনের অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ দশ ভাবে পড়া যায়। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, দশ প্রকারে পড়া যায়। এর মধ্যে সাত প্রকারের পড়া প্রসিদ্ধ। সব সময় আমরা যে উচ্চারণে তিলাওয়াত করে থাকি এটা সাত প্রকারের এক প্রকার। পরিভাষায় এই ইলমকে 'ইলমে তাজবীদ' বলা হয়। এ ধরনের ইলম শেখার জন্য আমরা এখানে (মারকাযে) দুই বছরের একটি কোর্স রেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ শুরু থেকেই এই কোর্সটি ভালোভাবে চলে আসছে।

২. অক্ষর ও শব্দের পাশাপাশি কুরআনের আরেকটি বিষয় হলো- অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ। পরিভাষায় যাকে 'ইলমে তাফসীর' বলা হয়। এ বিষয়ে একজন তালেবে ইলমকে পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য এখানে (মারকাযে) দুই বছরের একটি কোর্স রাখা হয়েছে। সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে বিভাগটি খুবই সুচারুরূপে চলছে।

উলূমুল হাদীস :

উলুমে মকসুদার দ্বিতীয় প্রকার হলো- উলূমুল হাদীস। উলূমুল হাদীস অসংখ্য বিষয়বস্তুর সমষ্টির নাম। তাই উলূমুল হাদীস বিভিন্নভাবে বিভক্ত। যেমন- (১) উলুমে হাদীসের একটি বিষয় হলো, 'মতনে হাদীস' এ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে এক বছরের কোর্স মিশকাত জামাত।

(২) আরেকটি বিষয় হলো, মতনে হাদীসের সাথে সাথে 'সনদে হাদীস' অর্থাৎ হাদীসের সূত্র। এ বিষয়ে পড়ানো হয় এক বছর। এর জন্য রাখা হয়েছে দাওরায়ে হাদীস।

(৩) দরজায়ে হাদীস, মি'আরে হাদীসসহ হাদীসসংক্রান্ত আরো যত বিষয় হতে পারে যেমন, ইলমু মুস্তালাহাতে হাদীস 'ইলমু আসমাইর রিজাল', ইলমুল জরহি ওয়াত তা'দীল, ইলমু ইলালিল হাদীস, ইলমু তাখরীজিল হাদীস ইত্যাদি সব বিষয়ে একজন তালিবে ইলমকে পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য দুই বছরের একটি কোর্সও রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ কোর্সটির পথচলা অত্র মারকায থেকে, আমাদের হাত ধরেই হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এর মকবুলিয়্যাত ঈর্ষণীয় পর্যায়ে।

ইলমুল ফিক্বহ :

এখানে 'ইলম' শব্দটি এক বচন উল্লেখ করেছি, অথচ আগে 'উলুম' বহুবচন উল্লেখ করেছি। কারণ ফিক্বহের কোনো প্রকার নেই। ফিকহ শুধুমাত্র একটি বিষয়েরই নাম। সেটা হলো, শরীয়তের

দলিল চতুষ্টয় দ্বারা প্রমাণিত শরয়ী বিধান। তবে সময়ের দাবি ও চাহিদা এবং বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায় আমরা ইলমে ফিক্বহকেও দু'ভাগে বিভক্ত করেছি।

(ক) ফিক্বহুল ইবাদাত।

(খ) ফিক্বহুল মু'আমালাত।

এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্যই দু'বছর করে মোট চার বছরের কোর্স রেখেছি। তালেবে ইলমের পুরো জীবনজুড়ে ফিক্বহুল ইবাদাত পড়া হলেও ফিকহুল মু'আমালাত পড়া হয় শুধুমাত্র হেদায়া কিতাবের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে। কেমন পড়া হয় কিভাবে পড়ানো হয় কারো অজানা নয়। এই দুর্বলতা শুধুমাত্র ফিকহুল ইবাদাতের কোর্স সম্পন্ন করলে দূর হয় না। এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তাই ফিকহুল ইবাদাতের কোর্স সম্পন্ন করে ফিকহুল মু'আমালাতের কোর্সও সম্পন্ন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তখনই একজন তালিবে ইলম ফিকহের কোর্স সম্পন্ন করেছে বলে বিবেচিত হবে। অতএব বলা যায়, ফিকহুল মু'আমালাতের কোর্স ফিকহুল ইবাদাতের সম্পূরক। একটি ছাড়া অপরটির পূর্ণতা অসম্ভব। অন্যান্য তাখাচ্ছুসের ন্যায় ফিকহুল মু'আমালাতও মারকাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটাও এখানেই শুরু হয়েছিল। তবে এই কোর্সের সঙ্গে যেহেতু জাগতিক শিক্ষারও কিছুটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে আবার এর ব্যাপকতা এবং আরো কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে আলাদা একটি জায়গার কথা ভাবা হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মারকায থেকে সোজা এক কিলোমিটার পূর্বে এর অবস্থান। জায়গা ভিন্ন হলেও প্রতিষ্ঠান এক ও অভিন্ন।

মারকাযের সেবামূলক আরো বহু বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বিভাগ। এ বিভাগ সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাব বা ফতওয়া প্রদান করা হয়। এ বিভাগ থেকে অদ্যবধি ২৫-৩০ হাজারের মতো লিখিত ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে। মৌখিক ফতওয়ার সংখ্যা এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। লিখিত ফতওয়াগুলো সংকলনের কাজ শুরু করা হয়েছে গত বছর থেকে। কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। দু'আ করো আল্লাহ তা'আলা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এ কাজটি যেন সম্পন্ন করে দেন।

এই হলো মারকাযের কোর্সগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। আমরা প্রথমেই সবক প্রদান করলাম উলূমুল কুরআনের দু'টি কিতাব জাযরী (ইলমে তাজবীদ) ও আল ইতকানের (ইলমে তাফসীর) মাধ্যমে। উলুমুল হাদীসের সবক প্রদান করলাম তিনটি কিতাব যথাক্রমে মতনে হাদীসের মিশকাত শরীফ, মতন ও সনদে হাদীসের বুখারী শরীফ ও দরজায়ে হাদীস ও মি'আরে হাদীসের আররফউ ওয়াত তাকমীল এর মাধ্যমে। আর ইলমে ফিকহের সবক প্রদান করা হলো, দু'টি কিতাব 'শরহু উকুদি রসমিল মুফতী' (ফিকহুল ইবাদাত) এবং 'আল মা'আঈরুশ শরইয়্যাহ' (ফিকহুল মুআমালাত)-এর মাধ্যমে।

জাদীদ তালেবে ইলমগণ!

তোমরা যারা দাখেলা পেয়েছ শুকরিয়া আদায় করো। আর যারা দাখেলার সুযোগ পাওনি তারা নিজেরাই বিচার করো এটা কার দোষ? আমরা তো দাখেলা ইমতেহানের এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, যেখানে কোনো খিয়ানত বা স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা ও সুযোগ নেই। দাখেলা ইমতেহানে সর্বমোট ১৩০০ জন নতুন ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৬১২ জন ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। মারকাযের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চশিক্ষার জন্য এ হারে ছাত্রদের আগ্রহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী।

একটি দু'আ ও তার ফলাফল :

এখানে আরেকটি কথা তোমাদেরকে বলে রাখি, আমরা সব সময় দু'আ করি যে, "হে আল্লাহ মারকাযে তোমার পছন্দনীয় ছাত্র ও উস্তাদদের ইজতিমা করে দাও।" এবার বল তো ভাই! আমার কী করার আছে? তোমরা যারা দাখেলা পেয়েছ আল্লাহর পছন্দনীয়। এটুকু আমি বলতে পারি। আর যারা পাওনি তাদের মঞ্জুরই হয়নি। সুতরাং আমার কিছু করার নেই।

একই কথা উস্তাদদের বেলায়ও যারা আল্লাহর পছন্দনীয়, আল্লাহ যত দিন পছন্দ করেন, আছেন এবং থাকবেন। কেউ বলতে পারবেন না আমরা কোনো উস্তাদকে বিদায় করেছি। আমরা কাউকে রাখতে চাইলেও আল্লাহ তা'আলা পছন্দ না করলে রাখতে পারব না।

আযীয তালাবা!

আমি মনে করি তোমরা আল্লাহর পছন্দনীয়, তাই তোমাদের দাখেলা হয়েছে, তবে এখন থেকে তোমাদেরকে চারটি কাজ করতে হবে এবং দুটি জিনিস ছাড়তে হবে।

করণীয় কাজগুলো হলো- (১) খাওয়ার সময় খাওয়া। (২) ঘুমের সময় ঘুমানো। (৩) পড়ার সময় পড়া। (৪) আর ইবাদতের সময় ইবাদত করা। উল্লেখ্য যে, আমাদের এখানে যা মা'মুলাত আদায় করা হয় তা তালিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বর্জনীয় কাজগুলো হলো- ১. মোবাইল ফোনের ব্যবহার। এ ছাড়াও যেকোনো ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের ব্যবহার বা সংরক্ষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ২. যেকোনো রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সংগঠনটি ইসলামী নামে হোক বা অন্য কোনো নামে।

মনে রেখো! আমরা কোনো ছাত্রকে বহিষ্কার করি না, তবে তোমাদের কেউ যদি এ দু'টি জিনিস (মোবাইল ও যেকোনো ধরনের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা) তরক করতে না পারো,

তাহলে আমরা বুঝে নেব যে তুমি আমাদের সাথে থাকতে চাও না। দরজা খোলা আছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেল। তুমি আমাদেরকে বিরক্ত করো না, আমরাও তোমাকে বিরক্ত করব না।

দেখ! যেখানে আমরা ছাত্র বিদায় করি না সেখানে কোনো উস্তাদকে কিভাবে বিদায় করব? কেউ বলতে পারবে না আমরা কাউকে বিদায় করেছি। তবে হ্যাঁ, উস্তাদদের বেলায়ও কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। সেগুলো কোনো উস্তাদের শান অনুযায়ী না হলে, আমরা মনে করি তিনি আমাদের সাথে থাকতে অপারগ, মারকায উনার শানের কদর করতে পারছে না। এমতাবস্থায় তাঁর শান তাকে মারকায থেকে চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। আচ্ছা বল তো ভাই! যারা তাদের শান মোতাবেক খেদমত করতে না পারার কারণে মারকায ছেড়ে চলে যেতে চান, আমি তাদেরকে কিভাবে রাখব?

স্মরণ রাখবে

এই মারকাযের পরিচালনা যেমন ভিন্নধর্মী এর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। এতদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তারীখে মারকায নামক বইয়ে উল্লেখ রয়েছে। বইটি সবার পড়ে নেওয়া উচিত। তার পরও সংক্ষেপে তোমাদের কিছু কথা বলছি। আমি দীর্ঘ ৩৫ বছর পটিয়া মাদরাসায় খেদমতে থাকার পর যখন ১৯৯০ সালে পটিয়া থেকে পৃথক হই, তখন দেশের শীর্ষ উলামাদের অনেকে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান করার পরামর্শ ও অনুরোধ করেন। কারো কারো পরামর্শ ছিল চট্টগ্রামে করার আর কারো মত ছিল রাজধানীতে। বিষয়টি নিয়ে আমার শাইখের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলে তিনি রাজধানী ঢাকায় এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান করার প্রতি মত দেন। অতঃপর আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে ১৯৯১ সালের ৫ মে রাজধানী ঢাকার উত্তরা মডেল টাউনের জসীমুদ্দীন এভিনিউতে ছোট্ট একটি ভাড়া বাড়িতে এ মারকাযের কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত ওয়ালা হারদূয়ী (রহ.) দু' রাকআত নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করেন। এই পর্যায়ে আমি হযরত ওয়ালা হারদূয়ী (রহ.)-এর কাছে প্রতিষ্ঠানটি সোপর্দ করার আবেদন করি। হযরত হারদূয়ী (রহ.) দু'টি শর্তে তা গ্রহণ করতে রাজি হন। (ক) প্রচলিত পদ্ধতিতে চাঁদা উঠানো যাবে না। (খ) তুমি কোনো ধনাঢ্যের কাছে মালের জন্য যেতে পারবে না। আমি অন্তর থেকে এ দু'টি শর্ত মেনে নিই এবং প্রতিষ্ঠানটি হযরতের হাতে সোপর্দ করে দিই।

হযরতের জীবদ্দশায় তাঁর পরামর্শ, নেক দু'আয় এ প্রতিষ্ঠানটি সুচারুরূপে চলতে থাকে। কোনো ব্যানার, পোস্টার, ইশতিহার, বিজ্ঞাপন এমনকি সাইন বোর্ডও ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি।

উত্তরার বাড়ি থেকে বসুন্ধরায় স্থায়ী জায়গায় মারকায :

উত্তরায় বছর যেতে না যেতে মহান আল্লাহ দয়া করে হযরত ওয়ালা হারদূয়ী (রহ.)-এর নেক দু'আয় স্থায়ী এ জায়গার ব্যবস্থা করে দেন।

কিভাবে হয়? হঠাৎ একদিন ক'জন লোক আসে। আমি মনে করলাম কোনো ফতওয়া নেওয়ার জন্য হয়তো এসেছে। বসলাম। কথাবার্তা হলো। তারা জানাল, তাদের কোম্পানি একটি নতুন কাজ শুরু করেছে বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প নামে। সেখানে তারা মসজিদ ও মাদরাসার জন্য কিছু জায়গা রেখেছে। তা আমাকে দিতে চায়। তারা আমাকে জায়গা দেখাতে নিয়ে আসে। দেখে তো আমি আতংকিত হয়ে যাই। জঙ্গল আর অথৈ পানি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। যা হোক তাদেরকে বললাম, এই জায়গা আপনারা দিতে চাইলে দিতে পারবেন না। আমি নিতে চাইলেই নিতে পারব না। তবে আল্লাহ তা'আলা চাইলেই শুধু হবে। এভাবে কিছুদিন পর ওই লোক সংবাদ পাঠাল হুজুরকে বলেন, এই জায়গা তো আমাদের কাউকে দিয়ে দিতে হবে। যদি কোনো খারাপ লোকের হাতে পড়ে এর দায় হুজুরকে নিতে হবে। আমি তখন উমরায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাই উত্তর পাঠালাম, আমি উমরায় গিয়ে দু'আ করব। আল্লাহ তা'আলা এই জায়গা কবুল করলে উমরা থেকে এসে সিদ্ধান্ত নেব। উমরাতে খুব দু'আ করলাম। হযরতের সাথে পরামর্শ করলাম। এরপর জায়গাটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এভাবে এই জায়গাতে মারকায স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পুরো প্রক্রিয়াতে আমার পক্ষে মারকাযের কোনো ব্যক্তির কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। এটি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর মেহেরবানী আর হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর তাওয়াজ্জুহ। কেউ যদি দাবি করে আমার প্রচেষ্টায় এই জায়গা মারকাযের নামে পাওয়া গেছে তা নিছক মিথ্যা ও ধোঁকা। জায়গার দাতাপক্ষের যারা এর সাথে জড়িত ছিল তারা এখনো জীবিত আছেন। (আল্লাহ তাঁদের দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন) কেউ জানতে চাইলে তাদের কাছে এখনো জানতে পারবে। বরং দীর্ঘদিন পরে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি, আমার অজান্তে কেউ কেউ উক্ত জায়গা নিজের নামে রেজিস্টারি করার জন্য মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ চেষ্টাও চালিয়েছে।

যাহোক, সংক্ষেপে কথাগুলো এ জন্য বললাম, কোনো কোনো সময় এগুলো নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়।

আমি আজ স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই এই প্রতিষ্ঠান হযরত ওয়ালা হারদূয়ী (রহ.)-এর দেওয়া শর্ত ও নীতিমালার ওপর চলছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই নেক বান্দার উসীলায় সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চালিয়ে নিচ্ছেন। এই মারকায যত দিন হযরতের দেওয়া নীতি ও আদর্শের ওপর

অটল থেকে পরিচালিত হবে, তত দিন কোনো সমস্যা হবে না ইনশা আল্লাহ। এ প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তিনির্ভর নয়। নীতি ও আদর্শনির্ভর।

এত গেল মারকাযের কথা। মারকায আমি সোপর্দ করেছিলাম হযরতের হাতে। আরেকটি প্রতিষ্ঠান হযরত নিজে প্রতিষ্ঠা করে আমার দায়িত্বে দিয়ে গেছেন। সে ব্যাপারেও তোমাদের কিছু কথা বলে রাখি। সে প্রতিষ্ঠানের নাম জামিয়াতুল আবরার বাংলাদেশ। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পের মনোরম পরিবেশে যার অবস্থান। হযরত ওয়ালা হারদূয়ী (রহ.) জীবনের সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরে ২৮/১২/২০০৪ ইংরেজিতে নিজ উদ্যোগে এ জামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে হযরতের দস্তে মোবারকে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান এটি। আখেরাতের পথে যাত্রা করার কটি দিন পূর্বে হারদূয়ী খানেকা শরীফে বসে অত্র জামিয়া কিভাবে চলবে, ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পরিচালনার নীতিমালা ও আদর্শ লিখিতাকারে আমাদের বুঝিয়ে দেন। বিশেষভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন :

১। জামি'আতুল আবরারে বিশুদ্ধ হিফযুল কুরআনের ব্যবস্থা রাখা।

২। জামা'আতে মীযান থেকে কিতাব বিভাগ চালু করা।

৩। নিম্নেবর্ণিত চারটি বিশেষ গুণাবলিসম্পন্ন উস্তাদ নিয়োগ করা।

(ক) বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের অধিকারী হওয়া।

(খ) সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়া।

(গ) কুরআন-হাদীসের খিদমাতের আগ্রহে আস্থাশীল হওয়া তথা বেতনকে মূল উদ্দেশ্যে পরিণত না করা।

(ঘ) শরয়ী পর্দার যথাযথ আনুগত্য করা।

৪। জামি'আর আশপাশে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা ও পড়ার পরিবেশ গড়ে তোলা।

প্রচলিত পদ্ধতিতে চাঁদা উঠানো এখানেও নিষেধ করলেন। বললেন মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী যেভাবে চলছে এ জামিয়াও ঠিক সেভাবে চলবে।

হযরতের দেওয়া নীতিমালার ভিত্তিতে জামিয়াতুল আবরার বাংলাদেশ মীযান জামাআত থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত সুস্থ ও সুন্দরভাবে চলছে আলহামদু লিল্লাহ। চলতি বছরে উচ্চতর তাজবীদ বিভাগও খোলা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ যত দিন হযরতের এই নীতি ও আদর্শের ওপর অটল ও অবিচল থাকবে, তত দিনও এ প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে চলবে, কোনো সমস্যা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নীতি-আদর্শের ওপর অটল থেকে হযরতের রূহানী ফয়জে সব সময় ধন্য হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ ও তার নিরসন

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

হানাফী মাযহাব হলো পৃথিবীর সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান এই মাযহাব অনুসারেই কুরআন-সুন্নাহর বিধান মেনে চলে আসছে।

লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে হানাফী মাযহাবকে কেউ অভিযুক্ত করেননি, এ দলটি সূচনালগ্ন থেকেই হানাফী মাযহাবের ওপর বিভিন্ন অভিযোগ আরোপ করে আসছে। তন্মধ্যে তাদের একটি বড় ও প্রসিদ্ধ অভিযোগ হলো এই যে, হানাফীগণ সাধারণত 'যঈফ' হাদীসের ওপর আমল করে থাকে। মূলত এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রপাগাণ্ডা ও ভিত্তিহীন অভিযোগমাত্র।

কেউ যদি ইনসাফের সাথে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি পাঠ করেন, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকৃত সত্য জানার জন্য নিম্নের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, এই অভিযোগ কতটা অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

কিতাবগুলো হলো :

১. কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা (ইমাম মুহাম্মাদ রহ.)
২. মুআত্তা মুহাম্মাদ (" " " " " ")
৩. কিতাবুল আছার (ইমাম আবু হানীফা রহ.)
৪. শরহু মা'আনিল আছার (ইমাম তহাবী রহ.)
৫. ফাতহুল কাদীর (ইবনুল হুমাম রহ.)
৬. নাসবুর রায়াহ (জামালুদ্দীন যাইলাঈ রহ.)
৭. আল জাওহারুন-নাকী (আলাউদ্দীন আত-তুরকুমানী রহ.)
৮. উমদাতুল ক্বারী (বদরুদ্দীন আইনী রহ.)
৯. ফাতহুল মূলহিম (শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.)
১০. বাযলুল মাজহুদ (খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.)
১১. ই'লাউস সুনান (যফর আহমাদ উসমানী রহ.)
১২. মা'আরিফুস সুনান (মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ.)
১৩. আছারুস সুনান (জহির নিমভী)
১৪. ফয়জুল বারী (আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.)
১৫. আউজাযুল মাসালিক (যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.)
১৬. আমানিল আহবার (ইউসুফ কান্ধলভী রহ.)

এই কিতাবগুলোতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হানাফী মাযহাবকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মাসআলা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে। তাই এই কিতাবগুলো পাঠ করে আপনিই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, হানাফী মাযহাব যঈফ হাদীসনির্ভর নাকি কুরআন-সুন্নাহসম্মত একটি সুদৃঢ় মাযহাব, যার স্বীকৃতি প্রতি যুগের মুহাক্কিক আলেমগণ দিয়েছেন।

তথাপি কিছু লোক এ অবান্তর অভিযোগ তোলে যে, "হানাফীগণ কোনো মাসআলায় সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও তার ওপর আমল না করে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করে থাকে।"

আমরা এখানে চারটি ধারায় এই অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করব ইনশাআল্লাহ্ ।

প্রথম ধারা :

চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণের পরবর্তীকালে যে সকল ফুকাহায়ে কেরাম উক্ত মাযহাবসমূহের ওপর কিতাবাদি রচনা করেছেন, তাতে মাসআলার সমর্থনে যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়, সে হাদীসগুলো মূলত হুবহু ওই দলিল নয়, যার ওপর স্বয়ং ইমামগণ মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন।

হ্যাঁ, অনেক সময় সংকলনকারীগণ -ইমাম যে দলিলের ওপর ভিত্তি করে মাসআলা বর্ণনা করেছেন, সে দলিলই উল্লেখ করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি যেসব হাদীস উল্লেখ করেন, সবই ইমামগণের প্রধান দলিল এবং ইমামগণ কর্তৃকই নির্বাচিত।

আসল কথা হলো, ফিক্বহের কিতাবাদিতে মূল মাসআলাসমূহ তো প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণেরই সংকলন করা, কিন্তু মাসআলাগুলোর সমর্থনে যে দলিল উল্লেখ করা হয়, তা অধিকাংশ সময়ই ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত তাদের নিজস্ব দলিল নয়, বরং সংকলনকারী কিতাব সংকলন করতে গিয়ে মাসআলার সমর্থনে নিজের অনুসন্ধানে যে হাদীস পেয়েছেন, তিনি তা-ই উল্লেখ করেছেন। আহলে ইলমগণ তো বুঝতেই পারছেন যে, তা ইমামের মূল দলিল নয়, বরং ইমামের নিকট অন্য কোনো হাদীস ছিল, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি মাসআলা বের করেছেন।

সুতরাং পরবর্তীতে সংকলিত কিতাবাদিতে কোনো হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা পাওয়া গেলে তার দায়ভার

ইমামের ওপর বর্তাবে না, এর দ্বারা মাসাআলার দুর্বলতা প্রমাণিত হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই, কারণ, মাসআলার ভিত্তি হিসেবে ইমাম সাহেবের নিকট অন্য কোনো মজবুত দলিল ছিল অথবা তার পরবর্তী যমানায় যঈফ রাবী যুক্ত হয়েছে। এ জাতীয় যঈফ হাদীসের কারণে কোনো ইমাম ও তার মাযহাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ইনসাফপূর্ণ আচরণ নয়।

এ নীতিটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয় হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিজে তার ফিক্বহের দলিল নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলন করে যাননি, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রহ.)ও নিজেদের ফিক্বহ ও দলিল সংকলন করে যাননি, আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) তার 'কিতাবুল উম্ম'-এ নিজের কিছু ফিক্বহ ও দলিল সংকলন করেছেন বটে, কিন্তু সমুদয় দলিল সংকলন করে যাননি।

অতএব, যে হাদীস আমরা হানাফী মাযহাবের 'হেদায়া' কিতাবে, মালেকী মাযহাবের 'আর রিসালা'তে, শাফেঈ মাযহাবের 'মুহাযযাবে' এবং হাম্বলী মাযহাবের 'আল মুগনী' ইত্যাদি কিতাবে পাই, এগুলোতে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই ওই মাযহাবের ইমামের মূল দলিল নয়।

এই মূলনীতিটি জানা না থাকার কারণে আহলে হাদীসের কোনো কোনো আলেম হানাফী মাযহাবের ফিক্বহের কিতাব 'হেদায়া'তে বর্ণিত মাসআলাসংক্রান্ত হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর মাযহাবের ব্যাপারে অনেক আপত্তিকর ও অবান্তর কথার অবতারণা করেছেন।

তারা হেদায়া এর হাদীস 'তাখরীজ' (সূত্র উল্লেখ) করতে গিয়ে যখন দেখলেন যে, মুহাদ্দিসগণ এই কিতাবে উল্লেখিত অনেক হাদীসকে 'যঈফ' 'মাওযু' 'গাইরে মারফু' ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছেন, তখন তারা সেই হাদীসগুলোকে মাযহাবের স্বয়ং ইমাম কর্তৃক উদ্ধৃত দলিল মনে করে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তার মাযহাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করে বলেন : আল্লাহ তা'আলার শরীয়তের বিষয়ে আবু হানীফা (রহ.)-কে কিভাবে আমরা ইমাম ও মুজতাহিদ হিসেবে মানব? অথচ তিনি 'মওযু' হাদীস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন। 'মওকুফ' ও 'মাকতু' (অর্থাৎ সাহাবীকর্তৃক বর্ণিত কথা বা সনদে বিচ্ছিন্নতা) হওয়া সত্ত্বেও তাকে রাসূলের হাদীস বলে দেন।

মূলত বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করেছে।

সংকলনকারীগণ নিজের থেকেই মাসআলার সমর্থনে দলিল উল্লেখ করে থাকেন। এই কথার দুটি দলিল আমি উল্লেখ করছি।

প্রথম দলিল :

ইমাম ইবনুস সালাহ (রহ.) বলেন : যে ব্যক্তি কোনো হাদীসের ওপর আমল করতে চায় বা কোনো মাযহাবের ইমামের মাসআলার সমর্থনে হাদীস দ্বারা দলিল দিতে চায় এবং সে এ বিষয়ে পারদর্শীও হয়, তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হলো, সে তার কপিটিকে কিতাবের মূল কপির সাথে মিলিয়ে দেখা, চাই মূল কপিটির সাথে সে নিজে মিলাক বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মিলাক। (মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ পৃ. ২৫)

ইমাম ইবনুস সালাহ এর উক্তি : 'কোনো মাযহাবের ইমামের মাসআলার সমর্থনে হাদীস দিয়ে দলিল দিতে চায় এবং সে এ বিষয়ে পারদর্শীও হয়' এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সংকলনকারীগণ নিজের থেকে মাসআলার সমর্থনে হাদীস উল্লেখ করে থাকেন।

দ্বিতীয় দলিল :

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) তার কিতাব বাদায়িউল ফাওয়াইদ এর প্রথম ফায়দাতে বলেন : لاشفعة لنصرانى অর্থাৎ : কোনো খ্রিস্টানের জন্য শুফআ [তথা পার্শ্ববর্তীতার সূত্রে জমি ক্রয়ে অগ্রাধিকার লাভ] এর হক নেই। এই হাদীস দ্বারা জনৈক আলেম ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মাযহাবের দলিল দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ (রহ.) ভালো করেই জানতেন যে, এর দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। কেননা এটি একজন তাবেঈর উক্তি মাত্র। অথচ হাম্বলী মাযহবের ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) তার কিতাব আল মুগনীতে এর দ্বারা দলিল দিয়েছেন এবং এটিকে দারাকুতনীর ই'লাল কিতাবের সূত্রে হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণিত মারূফ হাদীস সাব্যস্ত করেছেন। অপরদিকে বাইহাকী (রহ.) তার সুনানে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এটি হাসান বসরীর উক্তি, মারফূ হাদীস নয়। (আসারুল হাদীসিশ শরীফ পৃ. ২১০)

এখানে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর উক্তি 'এই হাদীস দ্বারা জনৈক আলেম ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মাযহাবের দলিল দিয়েছেনণ।' এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সংকলনকারীগণ মাসআলার সমর্থনে অনেক হাদীস নিজের অনুসন্ধান অনুযায়ী উল্লেখ করে থাকেন। অতএব পরবর্তী কিতাবগুলোর কোনো হাদীসে দুর্বলতা পাওয়া গেলে ইমামকে বা তার মাযহাবকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, বরং সেটাকে বর্ণনাকারীর ত্রুটি সাব্যস্ত করতে হবে।

দ্বিতীয় ধারা :

কখনো এমন হয় যে, ফিক্বহ সংকলনকারীগণ তাদের কিতাবে যে হাদীস উল্লেখ করেন তা স্বয়ং ইমামের দলিল। কিন্তু কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে শুধুমাত্র পরবর্তী যামানায় লিখিত হাদীসের কিতাবগুলো যেমন সিহাহ, সুনান, মাসানিদ ও মা'আজীমে তালাশ করে হাদীসের কিতাবাদির

সনদের ভিত্তিতে হাদীসটিকে অপ্রামাণ্য মনে করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি ফিকহের হাদীসসমূহকে শুধুমাত্র পরবর্তীকালে সংকলিত হাদীসের গ্রন্থসমূহে তালাশ করেন, তিনি হাদীসের সনদে দুর্বলতা দেখে হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করেন এবং ইমামের ওপর অপবাদ দেন, অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করেন।

আর যে ব্যক্তি ইনসাফের সাথে নিরপেক্ষভাবে হাদীস অনুসন্ধান করেন এবং মুহাদ্দিসগণের কিতাবের পাশাপাশি ইমামগণের নিজস্ব কিতাবেও সমান দৃষ্টি রাখেন, তিনি হাদীসটিকে সহীহ সনদে পেয়ে যান। প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন এবং ইমামগণ যে বাস্তবেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত, আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা যে পথভ্রষ্ট, এ বিশ্বাস অন্তরে আরও বদ্ধমূল হয়ে যায়।

* একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করছি :

হেদায়া কিতাবের গ্রন্থাকার তার কিতাবে ادرئوا الحدود بالشبهات এই হাদীসটি মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি যায়লঈ (রহ.) নসবুর রায়াতে তাখরীজ করেছেন যে, এটি মওকূফ, হযরত উমর (রাযি.)-এর উক্তি, কিন্তু সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। হযরত মু'আয (রাযি.) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) এবং হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) এ তিন সাহাবীরও উক্তি, কিন্তু সনদে ইবনু আবী ফারওয়া রয়েছেন, তিনি মাতরূক তথা পরিত্যক্ত, এটি ইমাম যুহরী (রহ.)-এরও উক্তি। তবে তিনি যেহেতু তাবেঈ তাই তার উক্তি দলিল হতে পারে না। ইবনে হাযম (রহ.) হাদীসটিকে মারফূ হিসেবে না পেয়ে মুহাল্লাতেই হাদীস সম্পর্কে এবং যে সকল ফকীহগণ এটিকে দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন তাদের ব্যাপারে অনেক রূঢ় শব্দ উচ্চারণ করেছেন, তার কলম ও যবান নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে, যেমন তার অভ্যাস। (আল্লাহ তা'আলা হিফাযতকারী)

বিশিষ্ট মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.) 'ফাতহুল কাদীর'-এ ইবনে হাযমের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন এবং ادرئوا الحدود بالشبهات এর অর্থ বুখারী মুসলিমের কয়েকটি হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন : নবী কারীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা (রা.)-এর বর্ণনা তালাশ করলে এ হাদীসের সত্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। যথা আমরা জানি, হযরত মায়েজ (রাযি.) যিনি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেছিলেন, তাকে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন : হয়তো তুমি চুম্বন করেছ বা স্পর্শ করেছ, বা মর্দন করেছ, এসব কিছু তাকে বলেছেন যেন সে এর কোনো একটিকে স্বীকার করে নেয়, যাতে করে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। অন্যথায় এ কথাগুলো বলার কোনো অর্থ নেই।

হদ (শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড) ছাড়া অন্য কোথাও এর প্রমাণ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ যথা ঋণখেলাপির কথা স্বীকার করেছে, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন, "হয়তো তোমার কাছে তা আমানত ছিল, পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে" বা এ-জাতীয় কোনো কৌশল শিখিয়েছেন, যাতে সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে। অতএব এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে, যথা সম্ভব 'হদ' যেন প্রমাণিত না হয় সেই চেষ্টাই করতে হবে। তার পরও শরীয়তে অত্যাবশ্যকীয় এ শাশ্বত বিধান সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা শরীয়তের কোনো অকাট্য প্রমাণিত বিষয়ে সংশয় পোষণ করারই নামান্তর।

তা ছাড়া এই হাদীসটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) স্বয়ং তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

কিতাবুল হুদূদের চতুর্থ হাদীস :

عن مقسم عن ابن عباس رضـ قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرئوا الحدود بالشبهات

মিকসাম ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। আহমাদ ইবনু সালেহ আল মিসরী (যিনি মিসরের তৎকালীনইমাম ছিলেন) ইজলী, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান এবং ইমাম দারাকুতনী এই চারজন ইমাম তাকে ছিকাহ বলেছেন, আর ইবনে আববাস (রা.) তো নিজেই নিজের তুলনা, এই সনদ ছাড়া হাদীসটির আর কোনো মারফু' সহীহ সনদ নেই। এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইমামগণেরও নিজস্ব সনদ রয়েছে এবং ফিকহের কিতাবের হাদীস তাখরীজ করার ক্ষেত্রে সম্ভব হলে তাদের নিজস্ব কিতাবাদি থেকেই তাখরীজ করব। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের তাখরীজকে ইমামগণের বর্ণনা যাচাইয়ের চূড়ান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করব না এবং ইমামদের মাযহাবকে দুর্বল ভাবব না।

তাখরীজের এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেই আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) 'মুনয়াতুল আলমাঈ' নামক কিতাবে ওই সকল হাদীসের সনদ দেখিয়েছেন, যেগুলো যাইলাঈ (রহ.) নাসবুর রায়াতে এবং ইবনে হাজার (রহ.) দেরায়াতে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সনদ তিনি ফিকহে হানাফির মৌলিক উৎস তথা হানাফি ইমামগণের রচিত হাদিস ও ফিকহের কিতাবাদি থেকে উদ্ধার করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ও রফউল মালাম কিতাবে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'হাদিসের কিতাবসমূহ সংকলনের পূর্বের ইমামগণ পরবর্তীদের তুলনায় সুন্নাহর ব্যাপারে অনেক বেশি

অবগত ছিলেন। কেননা অনেক হাদীস যা তাদের কাছে সহীহ সনদে পৌঁছেছে সেগুলোই আমাদের কাছে মাজহুল তথা অপরিচিত রাবীর মাধ্যমে পৌঁছেছে বা মুনকাতি তথা বিচ্ছিন্ন সনদে পৌঁছেছে বা একেবারেই পৌঁছেনি।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহ.) ওই কথা 'একেবারেই পৌঁছেনি' ইবনে হাজার (রহ.)-এর কথার সাথে একেবারে মিলে যায়, ইবনে হাজার (রহ.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ওই সকল হাদীস যেগুলো দ্বারা শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ এবং হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাদের ফিকহের কিতাবাদিতে দলিল দিয়ে থাকেন তার অধিকাংশই হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না, এর কারণ কী?

তিনি উত্তর দিলেন, হাদীসের অনেক কিতাব বা অধিকাংশ কিতাব তাতারি ফেতনার সময় নষ্ট হয়ে গেছে, হয়তো ওই হাদীসগুলো তাতেই তাখরীজ করা ছিল, কিন্তু তা আমাদের কাছে পাঁছেনি। এ কারণেই যারা কোনো কিতাবের হাদীস তাখরীজ করেছেন, যথা যাইলাঈ (রহ.), ইরাকী (রহ.), ইবনুল মুলাক্কীন (রহ.) এবং ইবনে হাজার (রহ.) তারা কোনো হাদিস না পেলে কারো ওপর দোষ না চাপিয়ে খুবই সতর্কতার সাথে বলেছেন যে, এ হাদিসটি আমি পাইনি, এ কথা বলেননি যে, এটা পাওয়া যায় না বা এর কোনো ভিত্তি নেই।

তৃতীয় ধারা :

কখনো ফুকাহায়ে কেরামের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদীসটি সনদের দিক থেকে তথা তাদের এবং পরবর্তীদের সকল সূত্র বাস্তবেই যঈফ হয়, কিন্তু হাদিসের স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহে ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাওয়ার কারণে হাদিস যঈফ হওয়া সত্ত্বেও তারা এটি আমলযোগ্য মনে করেছেন। যে সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়, সেগুলোই ইমামের মূল দলিল থাকে, যেহেতু আয়াত ও সহীহ হাদীসের সমর্থন সুস্পষ্ট নয়, এর বিপরীতে হাদীসটি উক্ত মাসআলায় সুস্পষ্ট, তাই পরবর্তী ফকীহগণ শুধুমাত্র হাদীসটিই উল্লেখ করে থাকেন, যদিও মাসআলার মূল ভিত্তি ওই সকল আয়াত ও সহীহ হাদীসের ওপরই থাকে, যা দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়, অন্যান্য সমর্থনকারী বিষয়গুলো উল্লেখ করেন না।

দুটি উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করছি :

(ক) তালাক দেওয়ার অধিকার হলো মূলত পুরুষের। ফুকাহায়ে কেরাম এর দলিল দিয়েছেন এই হাদীস দিয়ে :

انما الطلاق لمن أخذ بالساق .

অর্থাৎ তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল পুরুষের।

হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হাদীসটি সনদের দিক থেকে যঈফ, যেহেতু কুরআনের তালাকসংক্রান্ত আয়াতগুলো হাদীসটিকে সমর্থন করছে, তালাক প্রদানের অধিকারী পুরুষকে সাব্যস্ত করেছে, মহিলাকে নয়, তার সমর্থনে কুরআনের আয়াত বিদ্যমান থাকায় হাদীসটির দুর্বলতা এখানে গৌণ।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) যাদুল মা'আদে বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই হাদীসটির সনদে যদিও সমস্যা রয়েছে, কিন্তু কুরআন এই হাদীসটির সমর্থন করছে এ অনুসারেই প্রতিটি যুগে সকলের আমল চলে আসছে।

(খ) ফুকাহায়ে কেরাম টয়লেটে প্রবেশের সময় মাথা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব বলেছেন, এর স্বপক্ষে যে হাদীসটি রয়েছে তা হলো :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاء ه وغطى رأسه.

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তখন জুতা পরিধান করতেন, এবং মাথা ঢেকে নিতেন।

হাদীসের সনদ যদিও যঈফ, কিন্তু বুখারির মাগাযীতে এর সমর্থনে একটি হাদীস রয়েছে, তা হলো :

فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة.

(হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা.)

নিজের ঘটনার বর্ণনা এভাবে দিচ্ছেন যে, তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে ফটকের কাছাকাছি স্থানে মাথা ঢেকে এমনভাবে বসে পড়লেন যেন তিনি ইস্তিঞ্জা করছেন।

অন্য বর্ণনায় এর অর্থ আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি মাথা ঢেকে বসে পড়লাম, যাতে মনে হয় যে আমি ইস্তিঞ্জা করছি। বুখারী : হা, নং, ৪০৩৯, ৪০৪০,

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ইস্তিঞ্জার সময় মাথা ঢেকে রাখার বিষয়টি তাদের অভ্যাস ছিল।

আবুল হাসান ইবনুল হাসসার (রহ.) বলেন, যখন হাদীসের সনদে কোনো মিথ্যাবাদী না থাকে, উপরন্তু কুরআনের কোনো আয়াত এর সমর্থন করে, অথবা হাদীসটি শরীয়তের মূলনীতির সাথে মিল রাখে, তখন ফকীহগণ এ ধরনের হাদীসকে সহীহ বলেন এবং ওই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

চতুর্থ ধারা :

কখনো এমন হয় যে, ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণিত হাদীসটি যঈফ হয়, কিন্তু উক্ত মাসআলায় উক্ত যঈফ হাদিস ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাও নেই। তাই তারা অনন্যোপায় হয়ে যঈফ হাদিসকেই প্রাধান্য দিয়ে কিয়াস বর্জন করে থাকেন। এই নীতি অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অট্টহাসি দ্বারা ওজু ভেঙে যাওয়া, মধুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া, প্রভৃতি মাসায়িলে যঈফ হাদীসের মাধ্যমে কিয়াস বর্জন করেছেন এবং যঈফ হাদীস দ্বারা মাসআলা প্রমাণ

করেছেন।

হাদীসবিষয়ক কিছু মৌলিক নীতিমালা, যা সামনে থাকলে হানাফি মাযহাবের ওপর উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর সহজেই বুঝে আসবে।

১, সর্বপ্রথম যে কথাটি জেনে রাখা দরকার তা হলো :

সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম কিতাব দুটি সহীহ হাদীসের সংকলন মাত্র, এই দুটি কিতাবের বাইরে অনেক সহীহ হাদিস রয়েছে, এটা শুধু মৌখিক দাবিই নয়, বরং এটা এমন এক বাস্তবতা, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, এ কথা স্বয়ং বুখারী ও মুসলিম (রহ.)ও স্বীকার করেছেন।

আর হাদীসের সিহ্হত তথা বিশুদ্ধতা কোনো কিতাবের ওপর নির্ভর করে না যে, অমুক কিতাবে থাকলে সহীহ না থাকলে যঈফ, এ ধরনের কথা কোনো বিবেকবান মানুষ বলতে পারে না, বরং হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতিতে বর্ণিত শর্তাবলির ওপর, যে হাদীসের মধ্যে উক্ত শর্তাবলি পাওয়া যাবে সেটাই সহীহ হাদিস, আর যে সকল হাদীস শর্তের মাপকাঠিতে উন্নীত নয় সেটা সহীহ নয়।

অতএব, সহীহ হাদীস শুধু বুখারী-মুসলিমেই আছে অন্য কোনো কিতাবে নেই, অথবা অন্য কিতাবের হাদীসসমূহ এ দুটোর চেয়ে নিম্নমানের এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত নেই এবং কার্যত এর কোনো বাস্তবতাও নেই।

মোটকথা, যেকোনো হাদীসকে বিচার করতে হবে হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে, নির্দিষ্ট কোনো কিতাবের আলোকে নয়, এই বিষয়টি মাথায় রেখে কেউ যদি বিচার করে তাহলে হানাফি মাযহাবের বিরুদ্ধে প্রচারিত অনেক অমূলক অভিযোগ ও অপপ্রচারের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২. মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে পরস্পর মতপার্থক্যের যে রূপটি আমরা ফিকহের কিতাবাদিতে দেখি এবং একই মাসআলায় এক ইমাম থেকে একাধিক উক্তি পাই, এর প্রধান কারণ হলো, একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী হাদীস পাওয়া যাওয়া, আয়াত ও হাদীস একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখা, আয়াত ও হাদীস ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হওয়া অথবা কোনো নতুন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিধান না পাওয়া যাওয়া। সাধারণত এ ধরনেরর বিষয়েই ইমামগণের ইজতিহাদ করতে হয়, আর প্রত্যেক মুজতাহিদের তরীকে ইস্তিদলাল ও ইস্তিম্বাত তথা দলিল-প্রমাণের প্রায়োগিক পদ্ধতি ও মাসাইল আহরণের নীতিমালা সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র। যেমন একই বিষয়ে দৃশ্যত বিরোধপূর্ণ হাদীস থাকলে মুজতাহিদগণ কিভাবে সমাধান করেন এর একটু নমুনা দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে, মতপার্থক্য না হয়ে কোনো উপায় নেই।

একই বিষয়ে দৃশ্যত বিরোধপূর্ণ হাদীস থাকলে ইমাম মালেক (রহ.) মদীনাস্থ ফুকাহায়ে কেরামের আমল অনুযায়ী ফায়সালা দিয়ে থাকেন এই ভিত্তিতে যে, মদিনা হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের)-এর শহর, খুলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থানস্থল, আহলে বাইত ও আওলাদে রাসূল (সা.) -এর বাসভূমি, অহী নাযিল হওয়ার স্থান। অতএব মদীনাবাসীই ওহীর মর্ম অনুধাবনে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কোনো হাদীস তাদের আমলের বিপরীত হলে অবশ্যই সেটা হয়তো মানসুখ তথা রহিত, বা ব্যাখ্যাকৃত, বা ব্যক্তিবিশেষ বা স্থানবিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, বা মূল ঘটনা এখানে অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, তাই এটি দলিলযোগ্য নয়।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এ ক্ষেত্রে হেজাযবাসী ফকীহগণের আমল পরিলক্ষণ করেন, পাশাপাশি সর্বাধিক সহীহ হাদীসের প্রতি লক্ষ করেন। কোনো বর্ণনাকে এক অবস্থার সাথে এবং অন্য বর্ণনাকে অন্য অবস্থার সাথে নির্ধারণ করে যথাসম্ভব মিল করে দেন। অতঃপর যখন তিনি ইরাক ও শেষ জীবনে মিসর সফর করেন, সেখানে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে অনেক বর্ণনা শোনেন, তন্মধ্যে কিছু বর্ণনা তার নিকট হেজাযবাসীর আমলের ওপর প্রাধান্য পায়, ফলশ্রুতিতে শাফেয়ী মাযহাবে অনেক মাসআলায় নতুন-পুরাতন দুই ধরনের উক্তি পাওয়া যায়।

ইমাম আহমাদ (রহ.) প্রতিটি হাদীস বাহ্যিক অবস্থার ওপর বহাল রাখেন, মাসআলার প্রেক্ষাপট এক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটিকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। তার মাযহাব ইজতিহাদের বিপরীত ও হাদীসের যাহের অনুযায়ী, তাই হাম্বলী মাযহাবকে যাহেরীও বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা এবং তার আসহাবগণের নীতি হলো : সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর মধ্যে এমন একটি যুক্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো, যেন সকল হাদীসের মাঝেই একটি অর্থবহ প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এবং কোনো একটি হাদীসকেও বর্জন করতে না হয়। অধিকন্তু বাহ্যিক বিরোধটাও দূর হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে তারা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার সাথে বিশেষ করে কুরআন শরীফের কোনো আয়াত দ্বারা সমর্থিত কোনো হাদীসকে মৌলিকরূপে গ্রহণ করেন, যদিও সেটা সনদের দিক থেকে কিছুটা কম সহীহ, হাসান হয়, বা মারজুহ হয়, আর তুলনামূলক অধিক সহীহ হাদীসটির বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা করেন, এ নীতিই ছিল আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.)-এর।

(৩) কোনো হাদীসের সহীহ-যঈফ

হওয়া নির্ধারণ করাও একটি ইজতিহাদি বিষয়, এ কারণেই জারহ ওয়া তা'দীল তথা হাদীসের সনদ নিরীক্ষণ শাস্ত্রের সম্মানিত ইমামগণের মাঝেও একই হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা যায়, একজন ইমাম সহীহ বা হাসান বলেন, অন্যজন বলেন যঈফ, হাদিস শাস্ত্রের সাথে সামান্য সম্পর্ক আছে, তারা এ কথা ভালো করেই জানেন।

এ ভিত্তিতেই ইমাম আযম (রহ.) একটি হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করে গ্রহণ করেন, পক্ষান্তরে অন্য ইমামের দৃষ্টিতে তা যঈফ মনে হওয়ায় তিনি উক্ত হাদীস তরক করেন। তবে যেহেতু ইমাম আযম (রহ.) নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন, তাই অন্য কোনো মুজতাহিদের উক্তি তার বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না, এটাই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নীতি।

(৪) কখনো এমন হয় যে, কোনো একটি হাদীস ইমাম আযম (রহ.) পর্যন্ত সহীহ সনদে পৌঁছেছে, এ জন্য তিনি তা গ্রহণ করেছেন এবং তদানুযায়ী আমল করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে কোনো রাবীর দুর্বলতা হেতু হাদীসটির মাঝে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তাই পরবর্তী ইমামগণ সেটাকে গ্রহণ করেননি। অতএব পরবর্তীকালের সৃষ্ট দুর্বলতার দায় কিভাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর ওপর চাপানো যায়? আর এর ওপর ভিত্তি করে তিনি যঈফ হাদীসের ওপর আমল করেছেন; এ কথা বলা কি যুক্তিসংগত হবে?

(৫) অনেক সময় একটি হাদীসের একাধিক সনদ থাকে, কোনোটা সহীহ; কোনোটা যঈফ, এ ক্ষেত্রে যিনি হাদীসটি যঈফ সনদে পেয়েছেন; তিনি হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, আর যিনি সহীহ সনদে পেয়েছেন তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে :

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

অর্থ : যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়েন, ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত সাব্যস্ত হবে।

বিশেষ দু-একটি সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে ও কিতাবুল আছার ইত্যাদি গ্রন্থে সম্পূর্ণ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(৬) অনেক সময় একটি হাদীসের সব সনদই যঈফ হয়, কিন্তু একাধিক সনদের সমষ্টিগত বিচারে হাদীসটিকে গ্রহণ করা হয়, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয়, এ জাতীয় হাদীসের ওপর যারা আমল করেন; তাদেরকে যঈফ হাদীসের ওপর আমলকারী বলা ইনসাফপূর্ণ আচরণ হবে না। যেমন-একটি হাদীস হলো : كل قرض جر منفعة فهو ربا. (অর্থ, ঋণের বিনিময় যে লাভ অর্জিত হয় তাই সুদ) হাদীসটি অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সব সনদই যঈফ, তবে যেহেতু অধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে; তাই মুহাদ্দিস আযীযী (রহ.) 'আস-সিরাজুল মুনীর' এ হাসান লি গাইরিহি বলেছেন। আর হাসান লিগাইরিহী মানের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা স্বীকৃত ব্যাপার। সুতরাং এই হাদীসের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে লাভ অর্জন করা সুদ সাব্যস্ত হয়েছে। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- খণ্ড : ১ পৃ. ৫৬৮)

আমাদের অনেক বন্ধুগণ মনে করেন যে, যঈফ হাদীস মওযু তথা জাল হাদীসের পর্যায়ে, তাই যঈফ হাদীসকেও জাল হাদীসের মতো ছুড়ে ফেলেন, অথচ কোনো মুহাদ্দিসই এমনটি করেননি, কেননা মুহাদ্দিসগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যঈফ হাদীস ফাযায়েল ও মুস্তাহাব বিষয়ে শর্ত সাপেক্ষ গ্রহণযোগ্য, আহকামাত তথা দ্বীনের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা বা দলিল দেওয়া যায় কি না এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে আহকামাতেও যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যায়, এটা মুহাদ্দিসীনের এক অংশের কর্মপন্থাও। যথা আবু দাউদ, নাসাঈ, আবু হাতেমের শর্ত হলো- দুটি :

১. দুর্বলতাটি গুরুতর না হওয়া। ২. মাসআলার ক্ষেত্রে এ ছাড়া অন্য কোনো হাদীস না পাওয়া যাওয়া। এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, যঈফ হাদীস আমাদের নিকট কিয়াস বা রায় থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। এমনকি ইমাম শাফিয়ী (রহ.) যিনি মুরসাল হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করেন; তিনিও যেখানে মুরসাল ছাড়া অন্য কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, সেখানে মুরসাল হাদীস অনুযায়ীই আমল করেন। তা ছাড়া ইমাম শাফিয়ী (রহ.) তার কিতাবুল উম্মে অনেক মুরসাল হাদীস দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (আছারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ. ৩৬, ৩৭, ৩৮)

শায়খ আব্দুল্লাহ আস সিদ্দিক আল গুমারী (রহ.) বলেন : আহকামের মধ্যে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয় কথাটিকে অনেকেই বা সকলেই একটি স্বীকৃত নীতি মনে করেন, আসলে বিষয়টি এমন নয়। ...তিনি আরো বলেন : আমাদের মাকতাবায় তাজুদ্দীন আত-তিবরীযী এর মি'য়ার নামক কিতাব আছে, সংকলনকারী কিতাবটিকে ফিকহী তারতীবে সাজিয়েছেন, প্রত্যেক অধ্যায়ে কিছু যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন; যেগুলো চার মাযহাবের ইমামগণও সম্মিলিতভাবে বা এককভাবে গ্রহণ করেছেন। (আছারুল হাদীসিস শরীফ... পৃ. ৩৮)

শুধু তা-ই নয়, কখনো যদি কোনো যঈফ হাদীসের ওপর সকল সাহাবা ও তাবেঈন যুগ যুগ ধরে আমল করে

থাকেন; তাহলে এ কথাই বুঝতে হবে যে, এই হাদীসটি মূলত সহীহ, যদিও তার সনদ যঈফ। আর এ নীতির ভিত্তিতেই لا وصية لـــــوارث (অর্থঃ ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ নয়।) এ হাদীসটিকে সকল মুজতাহিদ গ্রহণ করেছেন।

এমনকি এ উসূলের ভিত্তিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যঈফ বর্ণনাকে সহীহ বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও কখনো প্রাসঙ্গিক দলিলের ভিত্তিতে যঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দেন এবং তার ওপর আমল করেন, যেমন অন্য ইমামগণও করেছেন, সুতরাং এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার কোনো সুযোগ নেই।

(৮) অনেক সময় দেখা যায়, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবকে সহীহভাবে জানারই চেষ্টা করা হয় না, অজ্ঞতাবশত তার মাযহাবকে হাদীস পরিপন্থী ধরে নেওয়া হয় এবং অনৈতিকভাবে তাঁকে দোষারোপ করা হয়, যেমন কোনো কোনো শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসও এ-জাতীয় ভুলের শিকার হয়েছেন, অথচ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হানাফী মাযহাব সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশুদ্ধ ও সংগঠিত শক্তিশালী মাযহাব। তথাপি উপরোক্ত অযাচিত ভুলের শিকার আহলে হাদীসের অধিকাংশ তথাকথিত আলেমগণও।

উদাহরণত বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম হযরত মাওলানা ইসমাইল সালাফী (রহ.) কেই দেখুন, তিনি "তা'দীলে আরকান"-এর মাসআলায় হানাফী মাযহাবের সমালোচনা করে লিখেন : হাদীস শরীফে আছে, ...অর্থাৎ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে নামায পড়ল, কিন্তু রুকু-সেজদা ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় করল না, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, صـــــل فـــإنك لـــم تـصـل""নামায পড়ে নাও, কারণ তুমি নামায পড়োনি, (অর্থাৎ, শরীয়তের দৃষ্টিতে তোমার নামায অস্তিত্বহীন) এরূপ ক্রমান্বয়ে তিনবার হলো। এই হাদীসের ভিত্তিতে আহলে হাদীস, শাফিয়ী ও অন্য কিছু ইমাম মনে করেন, রুকু-সিজদা ধীরস্থিরভাবে আদায় না করলে নামায আদায় হবে না। আর হানাফীগণ বলেন, রুকু-সিজদার অর্থ জানার পর আমরা হাদীসের ব্যাখ্যা আর নামায না হওয়ার সিদ্ধান্ত মানি না (?) (অর্থাৎ, ন্যূনতম রুকু-সেজদা করলেই নামায হয়ে যাবে) অথচ এটা হানাফী মাযহাব সম্পর্কে একটি ঘৃণ্য মিথ্যাচার।

বাস্তব কথা হলো, হানাফীগণও صـــــل فـإنك لـم تصل এই হাদীসের ভিত্তিতেই বলেন, যদি রুকু-সেজদা পূর্ণ ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় না করে, তাহলে ওয়াজিব তরক করার দরুন পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব। অতএব হানাফীগণ উপরোক্ত হাদীসের পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নকারী এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, তবে ইমাম আযম (রহ.) 'ফরজ' ও 'ওয়াজিব'-এর মাঝে পার্থক্য করেন, ধীর-স্থিরতাকে ওয়াজিব বলেন, আর অন্য ইমামগণ এই পার্থক্য মানেন না, তাই তারা ধীর-স্থিরতাকে ফরয বলেন।

ইমাম আযম (রহ.) বলেন, কুরআনে কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয় হলো ফরজ। আর 'খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় হলো ওয়াজিব। আমলগতভাবে এ দুয়ের মাঝে তেমন কোনো ফরাক নেই, ফরয ছেড়ে দিলেও নামায পুনরায় আদায় করতে হয়, ওয়াজিব ছেড়ে দিলেও নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। এ দুইয়ের মাঝে শুধুমাত্র ব্যাখ্যাগত পার্থক্য রয়েছে, ফরয ছেড়ে দিলে তাকে সরাসরি নামায পরিত্যাগকারী বলা হবে, পক্ষান্তরে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে বলা হবে ওয়াজিব পরিত্যাগকারী, অর্থাৎ তার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে।

একটু ঘুরিয়ে এটাকে এভাবেও বলা যায়, ওয়াজিব ত্যাগ করলে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, আর ফরয ত্যাগ করলে নামায পুনরায় আদায় করা ফরয।

আর এটা উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী কিছু নয়, স্বয়ং এই হাদীসের শেষাংশেই এর পক্ষে সমর্থন রয়েছে, অর্থাৎ,

ধীরস্থিরতা বর্জনকারীর নামাযকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাতিল বলেননি, বরং ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, এ কথাটি ইমাম আযম (রহ.)-এর পক্ষে একটি শক্তিশালী দলিল। যেমন তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ওই সাহাবীকে বললেন صل فإنك لم تصل অর্থাৎ, নামায পড়ে নাও, কারণ তুমি নামায পড়োনি, তখন বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কাছে খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল যে, একজন লোক একটু দ্রুত নামায পড়ল, তাই তাকে বলা হচ্ছে, "তুমি নামায পড়োনি" এর কিছুক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওই ব্যক্তির অনুরোধে নামাযের সহীহ তরীকা শিক্ষা দিতে গিয়ে ধীর-স্থিরভাবে নামায পড়ার তাগীদ করলেন এবং বললেন,

فإذا فعلت تمت صلوتك وإذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك .(رواه الترمذى٣٠٢ :

'এই কাজটুকু যখন তুমি করবে, তোমার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এতে কোনোরূপ ত্রুটি করলে তোমার নামায ত্রুটিপূর্ণ রয়ে যাবে।' এখানে তার নামায বাতিল হওয়ার কথা বলেননি, ধীর-স্থিরতা ফরয হলে তার নামায

ত্রুটিপূর্ণ নয়, বরং বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত রিফায়াহ (রা.) বলেন,

وكأنه هذا أهون عليهم من الأولى أنه انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلوته ولم تذهب كلها.

অর্থাৎ, এটি সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রথম কথার তুলনায় সহজতর মনে হয়েছে। কেননা এই বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো ত্রুটি হলে নামায তো ত্রুটিপূর্ণ হবে, তবে পূর্ণ নামায বাতিল হবে না। (তিরমিযী শরীফ হা, নং, ৩০২, ২৬৯৬)

হাদীসের এই অংশটি হানাফীদের আমলকে সুস্পষ্টরূপে পরিপূর্ণ সমর্থন করছে, তারা হাদীসের প্রথম অংশের ভিত্তিতে বলেন, "তা'দীলে আরকান" তথা "ধীর-স্থিরতা"র সাথে নামায না পড়লে তা পুনরায় আদায় করতে হবে, আর শেষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, যদি "তা'দীলে আরকান" ব্যতীত নামায পড়ে, সে ক্ষেত্রে তাকে নামায বর্জনকারী বলা যাবে না। আচ্ছা এই ব্যাখ্যার পর একটু চিন্তা করে বলুন, 'হানাফীগণ হাদীসের ব্যাখ্যা মানে না' এ ধরনের মন্তব্য কি ঠিক? এটা কি হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে ডাহা মিথ্যাচার নয়? সারকথা হলো, অনেক সময় হানাফী মাযহাবের প্রকৃত অবস্থান না জেনে না বুঝেই অনেকেই পাইকারিভাবেই বলে দেন যে, এটা হাদীসবিরোধী মাযহাব। উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে যদি কেউ হানাফী মাযহাবের পর্যালোচনা করেন, দলিল-প্রমাণের আলোকে নিরীক্ষণ করেন, তাহলে তার সামনে দিবালোকের ন্যায় এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, হানাফী মাযহাব যঈফ হাদীসনির্ভর হওয়া তো দূরের কথা, বরং এটি সুদৃঢ় দলিলভিত্তিক একটি মাযহাব, যা কুরআন-সুন্নাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী। এই মাযহাবে সতকর্তা ও খোদাভিরুতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে।

ইমাম শা'রানী, শাফিয়ী (রহ.)ও ইমাম আ'যমের সমালোচনাকারীদের জবাব লেখেন, তিনি বলেন, হে অভিযোগকারীগণ, তোমরা তাড়াহুড়া করো না, কারণ, ইমাম আ'যমের অনেকগুলো মুসনাদ থেকে আমার তিনখানা মুসনাদ পড়ার তৌফীক হয়েছে, যার দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি যে, তাদের অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন, উপরন্তু তার মাযহাবকে আমি সকল মাযহাবের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর অত্যাধিক নিকটবর্তী পেয়েছি। (মীযানুল কুবরা, ১/৮২-৮৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাস্তবতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

হজ ও উমরা

তাৎপর্য, ফযীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

(হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কারো তাওফীক্ব হলে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে হজের মাসাইল ও নিয়মনীতি সম্পর্কে সাধারণ লোক তো বটেই, এমনকি অনেক জানাশোনা লোকও বিভ্রান্তির শিকার হন। সে কারণে হজের পূর্বে এবং হজে থাকাকালীন হজের বিধিবিধান সম্পর্কে সম্মক জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। সাধারণের পক্ষে হজসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব নির্বাচন করা মুশকিল। কারণ বাজারে নির্ভরযোগ্য অনেক বই যেমন পাওয়া যায়, তেমনি হজ সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য বইয়েরও অভাব নেই। বক্ষমান প্রবন্ধে নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থের আলোকে হজের ফজীলত ও প্রয়োজনীয় বিধিবিধানগুলো সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো। প্রবন্ধটি তিনটিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে হজের ফজীলত ও ধারাবাহিকভাবে মাসায়েলগুলো। দ্বিতীয়ভাগে রায়েছে হজ পালন করার পদ্ধতি। তৃতীয়ভাগে রয়েছে হজের প্রয়োজনীয় দু'আসমূহ।

হজের ফরজিয়্যাত :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না। (আলে ইমরান ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ আদায় করে এবং সেখানে যাবতীয় মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকে সে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় গুনাহমুক্ত হয়ে ফিরবে। (বুখারী ১৪২৪)

হজের অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : মক্কা শরীফের ইচ্ছা করা। (আততারীফাত)

শরয়ী অর্থ : নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট স্থানের যিয়ারত করা। (আততা'রীফাত ১/২৬)

হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে পুরো উম্মত একমত। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

শর্তসমূহ :

হজের শর্তসমূহ দুই প্রকার।

১। হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :

নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে প্রত্যেক নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ ফরজ হয়। (বুখারী ১৪২৪, মুসলিম ২৩৮০)

১। মুসলমান হওয়া। অমুসলিমের ওপর হজ ফরজ নয়। (বুখারী ৩৫৬)

২। বালেগ হওয়া। নাবালেগের ওপর হজ ফরজ নয়। (বুখারী ১৬/৩১৫ বায়হাকী ১০১৩৩)

৩। আকলওয়ালা তথা বোধসম্পন্ন হওয়া। নির্বোধ পাগলের ওপর হজ ফরজ নয়। (বুখারী ১৬/৩১৫)

৪। আযাদ হওয়া, গোলামের ওপর হজ ফরজ নয়। (আলে ইমরান ৯৭, বায়হাকী ১০১৩৩)

৫। সামর্থ্যবান হওয়া।

সামর্থ্যবান হওয়ার অর্থ হলো, নিজের অনুপস্থিতিতে পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ও পাথেয়-এর মালিক হওয়া। (তিরমিযী ৭৪১) নারীদের ক্ষেত্রে নিজের এবং একজন মাহরামের হজে যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহনে সামর্থ্যবান হতে হবে।

২। হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ :

কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর নিজে হজ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো। এ সকল শর্ত পাওয়া না গেলে নিজে হজ করা ওয়াজিব হবে না। বরং অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ বদলি হজ করাতে হবে অথবা বদলি হজ করানোর জন্য অসিয়ত করতে হবে।

১। শারীরিকভাবে হজ করতে অক্ষম হওয়া। (বায়হাকী ৮৯২২)

২। হজে গমনে প্রতিবন্ধকতা না থাকা। যেমন কয়েদি, বাধ্য ব্যক্তি। (বায়হাকী ৮৯২২)

৩। রাস্তার নিরাপত্তা না থাকা। (সুনানে কুবরা ৮৯২২)

৪। নারী যুবতী হোক বা বৃদ্ধা তার সাথে স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম থাকা। (বুখারী ১০২৪, দারা কুতনী ২৪৬৭)

৫। মহিলা ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া। তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে। (সূরায়ে তালাক ১)

হজ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ :

নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে

হজ আদায় সহীহ হবে না।

১। ইহরাম তথা হজের নিয়ত করা। সুতরাং ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ আদায় সহীহ হবে না। (বুখারী ১)

ইহরামের নিয়ম হলো, মীকাত থেকে তালবিয়া পড়ার মাধ্যমে হজের নিয়্যাত করা। পুরুষরা ইহরামের সময় সেলাই করা কাপড় খুলে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করবে। (বুখারী ১৭০৭)

নারীরা স্বাভাবিক কাপড় পরবে। তবে নেকাব বা অন্য কোনো কাপড় চেহরার সাথে লেগে থাকতে পারবে না।

তালবিয়া এভাবে পড়বে :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

(বুখারী ১৪৪৮)

৩। সময়। সুতরাং হজের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে হজ আদায় সহীহ হবে না। (বাকারা ১৯৭)

মাসআলা : হজের মাস হলো ১। শাওয়াল, ২। যুলকাদা ৩। যিলহজের প্রথম দশ দিন। সুতরাং এ সময়ের আগে হজের তাওয়াফ বা সাঈ করলে সহীহ হবে না। হজের মাসের আগে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। (বুখারী ৫/৪৬১)

৩। নির্দিষ্ট স্থান। অর্থাৎ আরফায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফে যিয়ারত বায়তুল্লাহ শরীফে করা।

যদি সময়মতো আরাফায় অবস্থান না করা হয় বা তাওয়াফে যিয়ারত না করা হয় তবে হজ সহীহ হবে না। (নাসাঈ ২৯৬৬, সূরায়ে হজ ২৯)

ইহরাম বাঁধার মীকাত :

মীকাত হলো কিছু নির্দিষ্ট স্থান। হজ পালনোদ্দেশ্যে রওনাকারীগণের জন্য ইহরাম বাঁধা ছাড়া যে সকল নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করা জায়েয নয় সে স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়। (আউনুল মাবূদ ৪/১৩৯)

দিক ভিন্নতার কারণে মীকাতও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মীকাত হলো 'ইয়ালামলাম', মিসর, সিরিয়া এবং পশ্চিমাদের মীকাত হলো 'জুহফা', ইরাক তথা পূর্বের দেশসমূহের মীকাত হলো 'যুল হুলাইফা' এবং নজদবাসীর মীকাত হলো 'করন'। সুতরাং যে যেদিক থেকে আসবে মীকাতের আগে ইহরাম বেঁধে তারপর মীকাত অতিক্রম করতে হবে। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। মক্কাবাসীর মীকাত মক্কা। সুতরাং যে সকল লোক 'হিল'(মীকাত এবং হুদূদে হেরমের মধ্যবর্তী স্থান)-এ অবস্থান করছে তারা হুদূদে প্রবেশের পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। যারা হুদূদে হেরমে অবস্থান করছে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। (বুখারী ১৪২৭)

হজের ফরজসমূহ :

হজের ফরজ তিনটি।

১। ইহরাম বাঁধা। (সুনানে কুবরা ৯১৯০)

২। যিলহজ মাসের ৯ (নবম) তারিখ সূর্য হেলার পর থেকে ঈদুল আযহার দিন সুবহে সাদিক পর্যন্তের যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। এই সময়ের মধ্যে অতি অল্প সময়ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৮১৪)

৩। আরাফায় অবস্থানের পর কাবা শরীফে সাত চক্কর লাগানো। যাকে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে এফাযা বলা হয়।

হজের ওয়াজিবসমূহ :

১। সামান্য সময়ের জন্য হলেও মুযদালাফায় অবস্থান করা। এর সময় হলো যিলহজের দশ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। (সূরায়ে বাকারা ১৯৮, তিরমিযী ৮১৫)

২। সাফা মারওয়ায় সাত চক্কর লাগানো। যাকে সাঈ বলা হয়। চক্কর লাগানো আরম্ভ হবে সাফা থেকে আর শেষ হবে মারওয়ায়। (দারাকুতনী ২৬১৫, মুসলিম ২১৩৭)

৩। যথা সময়ে রমী করা। (শয়তানকে পাথর মারা) (মুসলিম ২২৮৬)

৪। তামাত্তু ও কেরান হজকারীগণ দমে শোকর তথা হজের কুরবানী করা।

৫। হারামে কোরবানির দিনসমূহে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা। (মুসলিম ২২৯৮, বুখারী ১৬১৩)

৬। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা তাওয়াফে সদর তথা তাওয়াফে বিদা' করা। (মুসলিম ২৩৫০)

উল্লেখ্য, এই ছয়টি হলো হজের ওয়াজিব। হজের আমলসমূহে আরো কিছু ওয়াজিব রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।

১। ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারাত (ফরজ তাওয়াফ) সম্পন্ন করা। (মুসলিম ২৩০৭, সুনানে কুবরা ৯৯২৮)

২। সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্তের পরও কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করা। (মুসলিম)

৩। তাওয়াফ অবস্থায় (হাদসে আকবার ও আসগার তথা ওজু বা গোসল ফরজ হয় এমন অবস্থা থেকে) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা। (নাসায়ী ২৮৭৩, মুসলিম ২১৭৩)

৪। প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা। (বুখারী ১৫১১)

৫। কেরান ও তামাত্তু হজকারী তারতীব বজায় রেখে তিনটি কাজ করা (ক) রমী (খ) কোরবানি এবং (গ) হলক। (সহীহ মুসলিম ১৯৮, উমদাতুল কারী ১০/৫৮)

৬। সতর ঢাকা। (বুখারী)

৭। তাওয়াফের সূচনা হজরে আসওয়াদ থেকে করা। (দারাকুতনী ২/২৮৯, মুসলিম ৮/১৭৪, মারাকিল ফালাহ ৭২৯)

হজের সুন্নাতসমূহ :

১। ইহরাম বাঁধার সময় গোসল বা ওজু করা এবং শরীরে খুশবু মাখা। (তিরমিযী ৭৬০, মুসলিম ৮/১০১)

২। নতুন বা পরিষ্কার চাদর পরা। সাদা

হওয়া উত্তম (মুসানাদে আহমদ ৪৮৯৯, তিরমিযী ৯১৫,২৭২৩)
৩। ইহরাম বাঁধার পর দুই রাক'আত নামায আদায় করা। (মুসলিম ২০৩১)
৪। বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। (মুসলিম ২২৪৬)
৫। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা তাওয়াফে কুদুম করা। (মুসলিম ২১৩৯)
৬। মক্কায় থাকাকালীন বেশি বেশি তাওয়াফ করা। (তিরমিযী ৭৯৪)
৭। 'ইযতিবা' করা। অর্থাৎ তাওয়াফ আরম্ভ করার আগে চাদরের একদিককে নিজের ডান বাহুর নিচে রাখা এবং অপর দিককে বাম কাঁধের ওপর পেঁচিয়ে দেওয়া। (তিরমিযী ৭৮৭)
৮। তাওয়াফের সময় 'রমল' করা। রমলের পদ্ধতি হলো তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করের সময় ঘনঘন কদম ফেলানো এবং উভয় কাঁধকে হেলতে হেলতে চলা। (বুখারী ১৫০১) (উল্লেখ্য, 'রমল' ও 'ইজতিবা' ওই তওয়াফে সুন্নাত যে তাওয়াফের পরে সাঈ করা হয়)
৯। সাঈ করার সময় উভয় মীলাইনে আখযারাইন (সবুজ বাতি)'র মধ্যখানে জোরে হাঁটা (পুরুষদের জন্য)। (মুসলিম ২১৩৭)
১০। তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া। (চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত উঁচিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু দেওয়া)। (আবু দাউদ ১৬০০, বুখারী ১৫০৬, ১৫০৭)
১১। কুরবানীর দিনসমূহে মিনাতে রাত যাপন করা। (আবু দাউদ ১৬৮৩)

হজে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ :

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মুহরিমের জন্য নাজায়েয। এ সকল কাজ থেকে মুহরিমদের বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক যাতে হজ নষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ না হয়।
১। ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস বা এরূপ কাজে আকৃষ্টকারী কোনো কাজ না করা। (সূরা বাকারা ১৯৮, রূহুল মাআনী ২/১৬৪)
২। কোনো প্রকার হারাম কাজ না করা। (গ্রাগুক্ত)
৩। গাল-মন্দ ও ঝগড়া থেকে বিরত থাকা। (গ্রাগুক্ত)
৪। খুশবু ব্যবহার না করা। যেমন আতর, গোলাপ, জাফরান ইত্যাদি। (বুখারী ১৭০৭,১৭০৮, মুসলিম ২০১৮)
৫। পুরুষরা সেলাইকৃত বস্ত্র না পরা। যেমন কুর্তা, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জুব্বা, মৌজা ইত্যাদি সেরূপ মাথা বা মুখ ঢেকে রাখার কাপড়চোপড়। (প্রাগুক্ত)
৬। নখ, মাথার চুল, দাড়ি এবং নাভির নিচের কেশ ইত্যাদি কর্তন না করা। (বাকারা ১৯৬, আলফিকহুল ইসলামী ৩/৬০৩)
৭। চুল বা (কেশ এবং) শরীরের কোনো অঙ্গে ঘ্রাণযুক্ত তেল না লাগানো। (বুখারী ৪৯১৮, বাদায়ে ৫/১৩০)
৮। হুদুদে হারামে গাছ বা ঘাস ইত্যাদি কর্তন না করা। (বুখারী ১৪৮৪)
৯। স্থলের কোনো বন্য প্রাণী শিকার না করা। উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয হোক বা নাজায়েয। (বাকারা ১৯৭, মায়েদা ৯৬, তিরমিযী ৭৭৫, বুখারী ১৭০৭ ইত্যাদি)

উমরা :

হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ যার মাঝে পাওয়া যাবে তার জন্য পুরো জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। (মুসনাদে আহমদ ১৪৪৩)
পুরো বছরই উমরা করা যায়। তবে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনসমূহে উমরার ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৪৮৫)
উমরার কাজ হলো চারটি : দু'টি ফরজ, দু'টি ওয়াজিব।

উমরার ফরজ দুটি :

১। ইহরাম বাঁধা। (বুখারী ১)
২। তাওয়াফ করা। (বুখারী ১৪৬৬)

উমরার ওয়াজিব দুটি :

১। সাফা মারওয়ার সাঈ করা। (প্রাগুক্ত)
২। মাথা মুণ্ডানো বা চুল কর্তন করে ছোট করা। (বুখারী ১৬১৩)

উমরাহ আদায়ের পদ্ধতি :

মক্কার নাগরিক বা অবস্থানরত লোক হিল (হারামের সীমানার বাইরে মীকাতের ভেতরের স্থান) থেকে আর মক্কার বাইরে থেকে আগন্তুক ব্যক্তি মীকাত থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ করবে এবং মাথা মুণ্ডাবে বা ছোট করবে। (বুখারী ১৪৫৯, মুসলিম ২০৩০)

হজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি :

হজ্ব তিন প্রকার–তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। এখানে প্রথমে হজ্জে তামাত্তুর আলোচনা এরপর বাকি দুই প্রকারের আলোচনা করা হবে।

হজে তামাত্তু

হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, যিলহজ) উমরাহর নিয়তে ইহরাম করে, উমরাহ পালন করে, পরে হজের নিয়ত করে হজ পালন করাকে হজ্জে তামাত্তু বলে।

ইহরাম :

প্রথমেই জেনে নিন আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ? নাকি মদীনা শরীফ? যদি মদীনা শরীফ হয়, তাহলে এখন ইহরাম বাঁধা নয়; যখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তখন ইহরাম বাঁধতে হবে। বেশির ভাগ হজযাত্রী আগে মক্কায় যান। এ ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরাম বাঁধা ভালো। কারণ, জেদ্দা পৌঁছার আগেই 'ইয়ালামলাম' মীকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানটি পড়ে। বিমানে যদিও ইহরাম বাঁধার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন; আর বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটাও দৃষ্টিকটু।
মনে রাখবেন, ইহরামের কাপড় পরিধান করলেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত করে 'তালবিয়া' তথা "লাব্বাইক ....." পড়া না হয়।

তাই ইহরামের কাপড় পরিধানের পর সতর্কতামূলক বিমান ছাড়ার পর নিয়ত করে তালবিয়া আরম্ভ করা ভালো। বিনা ইহরামে মীকাত পার হলে এ জন্য দম দিতে হবে। তদুপরি গুনাহ হবে।

ঢাকা বিমানবন্দর

উড্ডয়নের সঠিক সময় অনুযায়ী বিমানবন্দরে পৌঁছুন। আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানবন্দরে লাগেজে যে মাল দেবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নেবেন। বিমানের কাউন্টারে মাল রেখে এর টোকেন দিলে তা যত্ন করে রাখবেন। কারণ, জেদ্দা বিমানবন্দরে ওই টোকেন দেখালে সেই ব্যাগ আপনাকে ফেরত দেবে। ইমিগ্রেশন, চেকিংয়ের পর নিজ মালপত্র সযত্নে রাখুন।

বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পিলগ্রিম পাস, বিমানের টিকিট, টিকা দেওয়ার কার্ড, অন্য কাগজপত্র, টাকা, বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই ইত্যাদি গলায় ঝোলানোর ব্যাগে যত্নে রাখুন।

সময়মতো বিমানে উঠে নির্ধারিত আসনে বসুন।

জেদ্দা বিমানবন্দর :

মোয়াল্লিমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে বাড়িতে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লিমের নম্বর (আরবিতে লেখা) কবজি বেল্ট দেওয়া হবে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিম পাস নম্বর, নাম, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন।

জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছতে আনুমানিক দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। যানবাহনের ওঠানামার সময় ও চলার পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ.

মক্কায় পৌঁছে :

মক্কায় পৌঁছে আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, নামায আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে উমরাহর নিয়ত করে থাকলে উমরাহ পালন করুন।

মসজিদুল হারামে (কা'বা শরীফ) অনেকগুলো প্রবেশপথ আছে; সব কটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবি ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন-বাদশা আবদুল আজিজ প্রবেশপথ। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। আপনার সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।

কা'বা শরীফে স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থান তথা জুতা রাখার জায়গায় রাখুন। এখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে আর খুঁজে পাবেন না। প্রতিটি জুতা রাখার র‍্যাকেও নম্বর দেওয়া আছে। এই নম্বর স্মরণ রাখুন।

উমরাহর নিয়মকানুন আগে জেনে নেবেন, যেমন-সাত চক্করে তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান করা, নামায আদায় করা, সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো-যদিও মসৃণ পথ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করা-এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করা। ওয়াক্তীয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে ওই সময় নামায পড়ে আবার বাকিটুকু শেষ করা।

কা'বা শরীফ :

হারাম শরীফে প্রবেশ করার সময় এই দু'আ পড়া -

بِسْمِ اللهِ وَالصلاةُ والسَّلامُ عَلىٰ رَسُولِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

পড়বেন। মসজিদুল হারামে পুরুষ কোনো নারীর পাশে অথবা তাঁর সরাসরি পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন না।

কোনো দরজার সামনে নামায পড়া ঠিক নয়, এতে পথচারীর কষ্ট হয়।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নাত। তবে ভিড়ের কারণে না পারলে দূর থেকে চুমুর ইশারা করলেই চলবে। ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

১. উমরাহর ইহরাম (ফরজ)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে গোসল বা অজু করে নিন।

মীকাত অতিক্রমের আগেই সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, আরেকটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়ে নিন।

শুধু উমরাহর নিয়ত করে এক বা তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

ইহরামের নিয়তের সময় বলুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّى

এপর পর তালবিয়া এভাবে পড়ুন:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ.

২. উমরার তাওয়াফ (ফরজ)

অজুর সঙ্গে 'ইজতিবা'সহ তাওয়াফ করুন। ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।

হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়ান (২০০৬ সাল থেকে মেঝেতে সাদা মার্বেল পাথর আর ডান পাশে সবুজ বাতি)। তারপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করুন। তারপর ডানে গিয়ে এমনভাবে

দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে থাকে। এরপর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ اَكْبَـرُ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ

পড়ুন। পরে হাত ছেড়ে দিন এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কা'বাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করা সুন্নাত। 'রমল' অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা।

রুকনে ইয়ামানিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন। রুকনে ইয়ামানিতে এলে এই দু'আ পাঠ করুন। তবে চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে চক্কর পুরো করুন।

পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করুন।

হাতে সাত দানার তাসবীহ অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্কর ভুল হবে না।

৩. তাওয়াফের দুই রাকা'আত নামায (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বা হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়তে (মাকরূহ সময় ছাড়া) দুই রাকা'আত নামায পড়ে দুআ করুন। মনে রাখবেন, এটা দু'আ কবুলের সময়।

৪. উমরাহর সাঈ (ওয়াজিব)

সাফা পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে (এখন আর পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সাঈ-এর নিয়ত করে, দু'আর মতো করে হাত তুলে তিনবার তাকবির বলে দু'আ করুন। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে (এটা সেই জায়গা, যেখানে হজরত হাজেরা (রা.) পানির জন্য দৌড়েছিলেন) একটু দ্রুত পথ চলে মারওয়ায় পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হলো। মারওয়া পাহাড়ে উঠে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দু'আর মতো করে হাত তুলে তাকবির পড়ুন এবং আগের মতো চলে সেখান থেকে সাফায় পৌঁছলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হলো এভাবে সপ্তম চক্করে মারওয়ায় গিয়ে সাঈ শেষ করে দু'আ করুন।

সাঈ শেষে দুই রাক'আত নফল নামায পড়ুন। (মুস্তাহাব)

৫. হলক করা (ওয়াজিব)

পুরুষ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করবেন, তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। মহিলা হলে মাথার চুল এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন।

এ পর্যন্ত উমরাহর কাজ শেষ।

হজের ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত ইহরামের আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন।

৬. হজের ইহরাম (ফরজ)

হারাম শরীফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে শুধু হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ৮ যিলহজ জোহরের আগেই মিনায় পৌঁছে যাবেন।

নিয়ত করার সময় বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُالْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ

مِنِّى

৭. মিনায় অবস্থান (সুন্নাত)

৮ যিলহজ জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজরসহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করুন এবং এ সময়ে মিনায় অবস্থান করুন।

৮. আরাফার ময়দানে অবস্থান (ফরজ)

আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের অন্যতম ফরজ।

৯ যিলহজ দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করুন। এদিন নিজ তাঁবুতে জোহর ও আসরের নামায স্ব স্ব সময়ে আলাদাভাবে আদায় করুন। মুকিম হলে চার রাকাত পূর্ণ পড়ুন। মসজিদে নামিরায় উভয় নামায জামা'আতে পড়লে একসঙ্গে আদায় করতে পারেন, যদি ইমাম মুসাফির হন। আর মসজিদে নামিরা যদি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকে, তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করবেন। মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার দিকে রওনা হোন।

৯. মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব) রাত্রি যাপন (সুন্নাত)

আরাফায় সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় গিয়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক আজান ও এক ইকামতে একসঙ্গে আদায় করুন। (ওয়াজিব)

এখানেই রাত যাপন করুন (এটি সুন্নাত) এবং ১০ যিলহজ ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুযদালিফায় অবশ্যই অবস্থান করুন (এটি ওয়াজিব)। তবে দুর্বল (অপারগ) ও নারীদের বেলায় এটা অপরিহার্য নয়। রাতে ছোট ছোট ছোলার দানার মতো ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করুন। মুযদালিফায় কঙ্কর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

১০. কঙ্কর মারা (প্রথম দিন)

১০ যিলহজ সুবহে সাদিক থেকে ১১ যিলহজ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত শুধু বড় জামারাকে (বড় শয়তান) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। যদি

এই সময়ের মধ্যে কঙ্কর মারা না হয় তবে দম দিতে হবে।

১১. কোরবানি করা (ওয়াজিব)

১০ যিলহজ কঙ্কর মারার পরই কেবল দমে শোকর বা দমে তামাত্তু যাকে হজের কোরবানি বলা হয় নিশ্চিত পন্থায় আদায় করুন।

কোরবানির পরেই কেবল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা হলক করুন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছোটও করতে পারেন।

খেয়াল রাখবেন : কঙ্কর মারা, কোরবানি করা ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি

১২. তাওয়াফে যিয়ারত (ফরজ)

১২ যিলহজ সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে নিতে হবে। তা না হলে ১২ যিলহজের পরে তাওয়াফটি করে দম দিতে হবে। তবে নারীরা প্রাকৃতিক কারণে করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করবেন।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে যিয়ারতের সাথে সাঈ করাও ওয়াজিব। তবে হজের পূর্বে কোনো নফল তাওয়াফের সাথে সাঈ করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করতে হবে না।

১৩. কঙ্কর মারা (ওয়াজিব)

১১, ১২ তারিখে সূর্য হেলার পর থেকে পর দিন সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত ১ম, ২য়, ও ৩য় জামরায় ৭টি করে ২১টি কঙ্কর প্রতিদিন নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। সূর্য হেলার পূর্বে নিক্ষেপ করলে আদায় হবে না, বরং সূর্য হেলার পর পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় 'দম' দিতে হবে।

১৩ তারিখ সূর্য হেলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করত মিনা ত্যাগ করা সুন্নত। তবে কেউ যদি ১২ তারিখে চলে আসতে চায় তাহলে ওই দিন সূর্য হেলার পর থেকে পর দিন সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময় পাথর মেরে চলে আসতে পারবে। যদি কেউ ১৩ যিলহজ সুবহে সাদিকের পর মিনায় অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ তারিখও রমী করা ওয়াজিব। অন্যথায় দম দিতে হবে।

১৪. মিনা ত্যাগ

১৩ যিলহজ মিনায় না থাকতে চাইলে ১২ যিলহজ সন্ধ্যার আগে অথবা সন্ধ্যার পর ভোর হওয়ার আগে মিনা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতেই হবে–এটা ঠিক নয়। তবে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা উত্তম।

১৫. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

বাংলাদেশ থেকে আগত হজযাত্রীদের হজ শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয় (ওয়াজিব)। তবে হজ শেষে যেকোনো নফল তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হয়ে যায়।

নারীদের মাসিকের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই; দম দিতে হয় না।

১৬. মিনায় অবস্থানরত দিনগুলোতে (১০, ১১ যিলহজ) মিনাতেই রাত যাপন করুন। আর ১২ তারিখ রাত যাপন করুন যদি ১৩ তারিখ রমি (কঙ্কর মারা) শেষ করে ফিরতে চান (সুন্নাত)।

হজ্জে কিরান :

হজের দ্বিতীয় প্রকার হজ্জে কিরান।

কিরান শব্দের আভিধানিক অর্থ : দুই বস্তুকে একত্রিত করা।

শরীয়তে হজ্জে কিরান বলা হয় মীকাত থেকে হজ এবং উমরা উভয়টার একসাথে এহরাম বাঁধা।

উত্তম হজ হলো হজ্জে কিরান তারপর তামাত্তু তারপর ইফরাদ। (বুখারী ১৪৫৪, ১৪৬১, ১৪৬৬, ১৪৬০ সূরা বাকারা ১৯৬)

হজ্জে কিরানের নিয়তকারী এরূপ বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَالِىْ وَتَقَبَّلْهُمامِنِّىْ

অর্থ : আল্লাহ! আমি হজ এবং উমরার নিয়ত করেছি, উভয়টিকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং উভয়টি কবুল করো। (মুসলিম ২১৯৫)

হজ্জে কিরান আদায়ের পদ্ধতি

১. ইহরাম বাঁধা (ফরজ)

জেদ্দা পৌঁছানোর আগে একই নিয়মে ইহরাম করার কাজ সমাপ্ত করুন। তবে তালবিয়ার আগেই হজ ও উমরাহ উভয়ের নিয়ত একসঙ্গে করুন।

২. উমরাহর তাওয়াফ (পূর্বে বর্ণিত) নিয়মে আদায় করুন (ওয়াজিব)।

৩. উমরাহর সাঈ করুন, তবে এরপর মাথা মুণ্ডাবেন না বা চুল ছাঁটবেন না; বরং ইহরামের সব বিধিবিধান মেনে চলুন (ওয়াজিব)।

৪. তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করার প্রয়োজন নেই।

৫. আট যিলহজ জোহর থেকে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনাতে পড়ুন। এ সময়ে মিনাতে অবস্থান করুন (সুন্নাত)।

৬. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।

৭. নয় যিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে মুযদালিফায় অবস্থান এবং মাগরিব ও এশা একসঙ্গে এশার সময়ে আদায় করুন (ওয়াজিব)। তবে ১০ যিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান করুন (ওয়াজিব)।

৮. উপরে বর্ণিত নিয়ম ও সময় অনুসারে ১০ যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৯. দমে কেরান তথা হজের কোরবানি করুন (ওয়াজিব)।

১০. মাথার চুল মুণ্ডন করে নিন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন।

১১. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং সাঈ করে নিন, যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে থাকেন।

১২. এগারো-বারো যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। ১৩ যিলহজ

কঙ্কর মারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ।

১৩. মিনায় থাকাকালীন মিনাতেই রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

১৪. মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজিরা বিদায়ী তাওয়াফ করুন (ওয়াজিব)।

হজ্জে ইফরাদ :

হজের তৃতীয় প্রকার হজ্জে ইফরাদ। শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ সম্পাদনকে হজ্জে ইফরাদ বলে।

ইফরাদ হজ আদায়ের পদ্ধতি :

১. শুধু হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধুন (ফরজ)। এরূপ বলুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُالْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی

২. মক্কা শরিফ পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

উল্লেখ্য, তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করার প্রয়োজন নেই।

৩. মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

৪. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।

৫. মুযদালিফায় অবস্থান করুন (সুন্নাত)। তবে ১০ যিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব।

৬. ১০ যিলহজে জামারাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৭. যেহেতু এ হজে দমে শোকর ওয়াজিব নয়, তাই কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা হলক করে নিন; তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন (ওয়াজিব)।

৮. তাওয়াফে যিয়ারত করুন (ফরজ) যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করে থাকেন, তাহলে সাঈ করার প্রয়োজন নেই। (ওয়াজিব)।

১০. ১১-১২ জিলহজ আগে বর্ণিত নিয়ম ও সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

১১. বদলি হজকারী ইফরাদ হজ করবেন।

ইহরাম, অন্যান্য পরামর্শ

ইহরাম সম্পর্কে জরুরি বিষয় :

যাঁরা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তাঁরা বাড়িতে, হাজীক্যাম্পে বা বিমানে ইহরাম করে নেবেন। বাড়িতে বা হাজীক্যাম্পে ইহরাম করে নেওয়া সহজ। ইহরাম ছাড়া যেন মীকাত অতিক্রম না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

যাঁরা মদিনা শরীফ যাবেন, তাঁরা মদিনা শরীফ থেকে মক্কা যাওয়ার সময় ইহরাম করবেন। কোনো নারী প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র হয়ে থাকলে ইহরামের প্রয়োজন হলে অজু-গোসল করে নামাজ ব্যতীত লাব্বাইক পড়ে ইহরাম করে নেবেন। তাওয়াফ ছাড়া হজ, উমরাহর সমস্ত কাজ নির্ধারিত নিয়মে আদায় করবেন।

তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়

তাওয়াফের সময় অজু থাকা জরুরি। তবে সাঈ করার সময় অজু না থাকলেও সাঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া একটি সুন্নত। তা আদায় করতে গিয়ে লোকজনকে ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বড় গুনাহ। তাই তাওয়াফকালে বেশি ভিড় দেখলে ইশারায় চুমু দেবেন।

সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া কিংবা মারওয়া থেকে সাফা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন চক্কর। এভাবে সাতটি চক্কর সম্পূর্ণ হলে একটি সাঈ পূর্ণ হবে।

মাসআলা : হজ্জে তামাত্তুকারী ব্যক্তি ওই সময় হালাল হবে যদি সাথে হাদী না নেয়। যদি হাদী নেওয়া হয় তবে হালাল হবে না। এর পর ৮ই যিলহজ হেরম থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং হজের যাবতীয় কাজ আদায় করবে। (বুখারী ১৪৬৬)

মাসআলা : কোরবানীর দিন জামরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপের পর তামাত্তু ও কেরান হজকারীর জন্য একটি বকরি বা এক উটের সাত ভাগের এক ভাগ দমে শোকর বা হজের কুরবানী দেওয়া আবশ্যক। যদি জাবাইয়ের জন্য জন্তু পাওয়া না যায় তবে কুরবানীর দিনের আগে তিন দিন এবং হজ পালন শেষ করে সাত দিন রোযা রাখবে। এই রোযা সে তাশরীকের দিনসমূহের পর মক্কাতেই রাখতে পারে, চাইলে বাড়ি ফেরার পরও রাখতে পারে। যদি কুরবানীর দিনের পূর্বে তিন দিন রোযা না রাখে তবে পরে রোযা রাখলে হবে না। বরং তাকে কুরবানীই দিতে হবে। (বাকারা ১৯৬, মুসান্নাফে ইবনে শাইবা ৫২২,৫২৩)

মক্কায় দু'আ কবুল হওয়ার কয়েকটি স্থান

আল্লামা জাযরী (রহ.) হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর সূত্রে মক্কার এমন কিছু স্থান ও সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যেখানে দু'আ কবুল হয়। তা নিম্নরূপ:

১। তাওয়াফের সময়। ২। মুলতাযিমের কাছে। ৩। মীযাবের নিচে। ৪। কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে। ৫। জমজম কূপের পাশে। ৬। সাফা পাহাড়ে। ৭। মারওয়া পাহাড়ে। ৮। সাঈর সময়। ৯। মকামে ইবরাহীমের পেছনে। ১০। আরাফার ময়দানে। ১১। মুযদালিফায়। ১২। মিনাতে। ১৩। জামরায়ে উলাতে।১৪। জামারায়ে উস্তাতে। (হাসান ৬৫)

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এসবের সাথে আরো যুক্ত করে বলেছেন, রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি, দারে আরকাম, গারে সাওর, গারে হেরা ইত্যাদিও দু'আ কবুল হওয়ার স্থান। (নযলুল আবরার ৪৫)

সুতরাং হাজী সাহেবানদের উচিত এসব স্থান ও সময়ে কায়মনোবাক্যে অশ্রুসজল নয়নে আল্লাহর কাছে মন খুলে দু'আ করা।

হজের প্রয়োজনীয় দু'আসমূহ

হুদুদে হারামে প্রবেশের দু'আ :

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, হুদুদে হারামে প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করা।

اَللّٰهُمَّ هٰذا حَرَمُکَ وَاَمَنُکَ

جَلَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَلَّغَنِیْ بَیْتَهُ وَزَانَنِیْ لِذٰلِکَ اَهْلاً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ دَعَوْتَ اِلٰی حَجِّ بَیْتِکَ وَقَدْ جِئْنَاکَ لِذٰلِکَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ وَاعْفُ عَنِّیْ وَاَصْلِحْ لِیْ شَانِیْ کُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (هداية السالک ۲/۷۴۶)

হযরত সঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে এই দু'আ পড়বে –

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْکَ السَّلَامُ حَیِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ (بيهقی ۵/۷۳)

এরপর দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের জন্য যে কোনো দু'আ করলে তা কবুল হয়।

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের দু'আ কবুল করা হয়। সুতরাং কাবা শরীফের ওপর যখনই নজর পড়বে তখন হাত উঠিয়ে দু'আ করা উচিত।

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করার সময় :

হযরত আলী (রা.) যখন হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন তখন এই দু'আ পড়তেন –

اَللّٰهُمَّ اِیْمَاناً بِکَ وَتَصْدِیْقاً بِکِتَابِکَ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِیِّکَ (الدعاء ۲/۱۲۰۱)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়ার সময় এই দু'আ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِیْمَاناً بِکَ وَتَصْدِیْقًا بِکِتَابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ السَّلَامُ (الدعاء للطبرانی ۲/۱۲۰۱)

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রের বর্ণিত, বলেন, যখন মক্কায় প্রবেশ করা হবে তখন এই দু'আ পড়া –

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَاَنَا عَبْدُکَ وَالْبَلَدُ بَلَدُکَ جِئْتُ فَارًّا مِنْکَ اِلَیْکَ لِاُوَدِّیَ فَرَائِضَکَ مُتَّبِعاً لِاَمْرِکَ رَاضِیًا بِقَضَائِکَ اَسْئَلُکَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلٰی رَحْمَتِکَ الْمُشْفِقُ مِنْ عَذَابِکَ الْخَائِفُ مِنْ عُقُوْبَتِکَ اَسْئَلُکَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِیْ بِعَفْوِکَ وَتَحْفَظَنِیْ بِرَحْمَتِکَ وَتَجَاوَزَ عَنِّیْ بِمَغْفِرَتِکَ وَتُعِیْنَنِیْ عَلٰی اَدَاءِ فَرَائِضِکَ (هداية السالک ۲/۷۴۶)

কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে এই দু'আ পড়া :

হযরত হুযাইফা ইবনে আসয়াদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন কা'বা শরীফ দেখতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَیْتَکَ هٰذا تَشْرِیْفاً وَتَعْظِیْماً وَتَکْرِیْماً وَبِرًّا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِیْماً وَتَشْرِیْفاً وَبِرًّا وَمَهَابَةً (الدعاء ۱۱۹۸، بيهقی ۵/۷۳۵)

পবিত্র কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উঠিয়ে বিনয়ের সাথে দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য বিভিন্ন দু'আ পড়া উচিত। কারণ এটি দু'আ কবুল হওয়ার সময়। (হেদায়াতুস সালেক ২/৭৫১)

ইবনুল জওযী (রহ.) পবিত্র কাবা শরীফের দিদার হলে এই দু'আ পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْکَ السَّلَامُ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کَثِیْراً کَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَکَمَا یَنْبَغِیْ لِکَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ فَاَسْئَلُکَ اَنْ تُحَرِّمَ لَحْمِیْ وَدَمِیْ عَلَی النَّارِ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنْ عَذَابِکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ، وَوَفِّقْنِیْ لِلْعَمَلِ بِطَاعَتِکَ وَامْنُنْ عَلَیَّ بِقَضَاءِ مَنَاسِکِکَ وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ (هداية السالک ۲/۷۰۷)

হারামে মক্কায় প্রবেশের দু'আ :

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর দাদার সূত্রে বলেন, রাসূল (সা.) মক্কায় প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اَلْبَلَدُ بَلَدُکَ وَالْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ اَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَاَلْزِمُ طَاعَتَکَ مُتَّبِعاً لِاَمْرِکَ رَاضِیاً بِقُدْرَتِکَ مُسْتَسْلِماً لِاَمْرِکَ اَسْئَلُکَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلَیْکَ الْمُشْفِقُ مِنْ عَذَابِکَ خَائِفاً لِعُقُوْبَتِکَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِیْ بِعَفْوِکَ وَاَنْ تَتَجَاوَزَ عَنِّیْ بِرَحْمَتِکَ وَاَنْ تُدْخِلَنِیْ جَنَّتَکَ (هداية السالک ۲/۴۵، الفتوحات ۴/۳۶۸)

ইমাম নববী (রহ.) কিতাবুল আযকারে লেখেন, হারামে মক্কায় পৌঁছে এই দুই পড়া :

اَللّٰهُمَّ هٰذا حَرَمُکَ وَاَمَنُکَ فَحَرِّمْنِیْ عَلَی النَّارِ وَاَمِّنِّیْ مِنْ عَذَابِکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ اَوْلِیَائِکَ وَاَهْلِ طَاعَتِکَ (اذکار ۱۲۵)

মক্কা শরীফে প্রবেশের দু'আ :

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা শরীফে প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُنَایَا نَابِهَا حَتّٰی تَخْرُجَنَا مِنْهَا (الدعاء للطبرانی ۸۵۳)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

রমল করার সময় :

রমল করার সময় এই দু'আ পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَاَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (السنن الكبرى للبيهقى،باب القول فى الطواف رقم الحديث ٩٥٥٥)

তাওয়াফের নামায শেষে :

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকট গিয়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং এই দু'আ পড়লেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذا بَلَدُكَ وَبَيْتُكَ الْحَرَامُ وَالْمَسجِدُ الْحَرَامُ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ اَتَيْتُكَ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وَخَطَايَا جُمَّةٍ وَاَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَهٰذا مُقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم،اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ دَعَوْتَ عِبَادَكَ اِلى بَيْتِكَ وَقَدْ جِئْتُ طَالِباً رَحْمَتَكَ وَمُبْتَغِيًا رِضْوَانَكَ وَاَنْتَ مَنَنْتَ عَلَّى بِذٰلِكَ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرىٰ مَكَانِى وَ تَسْمَعُ دُعَائِى وَنِدَائِى وَلَا يَخْفىٰ عَلَيْكَ شَىءٌ مِنْ اَمْرِى هٰذا مَقَامُ الْعَائِذِ الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ الْمُسْتَغِيْثِ الْمُقِرِّ بِخَطِيئته الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِه التَّائِبِ اِلىٰ رَبِّه فَلا تَقْطَعْ رَجَائِىْ وَلَا تُخَيِّبْ اَمَلِىْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (الفتوحات الربانية ٣٩٠/٣)

তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়ার সময় বলতেন–

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ

হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার সময় বলতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ (الدعاء ١٢٠٢/٢)

হযরত ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা হাজরের আসওয়াদে চুমু দেওয়ার সময় শেষ পর্যন্ত এই দু'আ পড়তেন, আকাবিরগণের মামূলও এটি।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيْمَاناً بِكَ

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানের দু'আ :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)-কে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়তে দেখেছেন :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (الحاكم ٤٥٥/١،الدعاء للطبرانى ١٢٠٠/٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে ইরশাদ করেন, সেখানে সত্তর জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, উক্ত স্থানে এই দু'আ পাঠ করা হলে ফেরেশতারা আমীন বলে থাকেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سنن ابن ماجه،باب فضل الطواف رقم الحديث ٢٩٤٨)

তাওয়াফের সময়ের দু'আসমূহ :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে লোক সাত চক্কর তাওয়াফ করবে এবং তাতে কোনো কথাবার্তা না বলে শুধু এই দু'আ পড়তে থাকবে তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে, তার নামে দশটি নেকী লেখা হবে এবং দশ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (ابن ماجه،باب مايدعوبه اذا انتبه من الليل رقم الحديث ٣٨٦٨)

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাওয়াফের সময় এই দু'আ পড়তেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (هداية السالك ٨٣٥/٢)

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়া :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) দুই রুকনের মধ্যবর্তী এই দু'আ পাঠ করতেন –

رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْه وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ (هداية السالك ٨٣٠/٢،الحاكم ٤٥٥/١)

হযরত আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) রুকনে ইয়ামানী অতিক্রম করার সময় এই দু'আ পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَمَوَاقِفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (هداية السالك ٨٣١/٢)

হযরত আদম (আ.) বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার পর একটি স্থানে (মকামে ইবরাহীম) পৌঁছে দুই রাক'আত নামায আদায় করেন এবং এই দু'আ পাঠ করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَعَلانِیَتِیْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِیْ فَاعْطِنِیْ سُؤْلِیْ وَتَعْلَمُ مَا عِنْدِیْ فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ،اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اِیْمَاناً یُبَاشِرُ قَلْبِیْ وَیَقِیْناً صَادِقاً حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَاکَتَبْتَ لِیْ وَالرِّضٰی بِمَا قَضَیْتَ عَلَّیَ (هداية السالک ۱/۸۶۲،الفتوحات الربانية ۴/۳۹۰)

তাওয়াফ শেষে মুলতাযিমে এই দু'আ পড়া :

হযরত সুলইমান পিতার সূত্রে বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, হযরত আদম আ. দুনিয়াতে আসার পর কাবা শরীফের তাওয়াফ করেন এরপর কাবার দরজার সামনে দুই রাক'আত নামায পড়ে এই দু'আ পাঠ করেন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَم سَرِیْرَتِیْ وَعَلانِیَتِیْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِیْ فَاعْطِنِیْ سُؤْلِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اِیْمَاناً یُبَاشِرُ قَلْبِیْ وَیَقِیْناً صَادِقاً حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَاکَتَبْتَ لِیْ وَالرِّضَاء بِمَا قَضَیْتَ عَلَّیَ (هداية السالک ۱/۷۰)

মুলতাযিমে পড়ার আরেকটি দু'আ :

ইমাম বায়হাকী (রহ.) হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তাওয়াফে বিদার পর মুলতাযিমের সামনে এই দু'আ পড়া :

اَللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ أَمَتِکَ حَمَلْتَنِی عَلَی مَا سَخَّرْتَ لِی مِنْ خَلْقِکَ حَتَّی سَیَّرْتَنِی فِی بِلادِکَ وَبَلَّغْتَنِی بِنِعْمَتِکَ حَتَّی أَعَنْتَنِی عَلَی قَضَاءِ مَنَاسِکِکَ فَإِنْ کُنْتَ رَضِیتَ عَنِّی فَازْدَدْ عَنِّی رِضًا وَإِلَّا فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْاٰی عَنْ بَیْتِکَ دَارِی فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِی إِنْ أَذِنْتَ لِی غَیْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَلا بِبَیْتِکَ وَلا رَاغِبٍ عَنکَ وَلا عَنْ بَیْتِکَ اللَّهُمَّ فَاصْحَبْنِی بِالْعَافِیةِ فِی بَدَنِی وَالْعِصْمَةِ فِی دِینِی وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِی وَارْزُقْنِی طَاعَتَکَ مَا أَبْقَیْتَنِی وَاجْمَعْ لِی خَیْرِی الْآخِرَةِ وَالدُّنْیَا اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

(الاذکار ۱۷۳)

যমযমের পানি পান করা :

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তা পূর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যমযমের পানি পান করার সময় এই দু'আ পাঠ করতেন –

اَللّٰهُمَّ اِنی اَسْئَلُکَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ (ابن ماجه رقم الحديث ۳۰۶۲، مستدرک حاکم ۱/۴۷۳،حصن ۳۰۴)

হাতীমের দু'আ :

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের বোন মুলাইকা বিনতে মুনকাদির থেকে হাতীমের সামনে এই দু'আ বর্ণিত আছে–

یَا رَبِّ اَتَیْتُکَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیْدَةٍ مُوَمَّلًا مَعْرُوفَکَ فَاَنِلْنِی مَعْرُوْفاً مِنْ مَعْرُوْفِکَ تُغْنِیْنِیْ بِه عَنْ مَعْرُوْفِ مَنْ سِوَاکَ یَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ

(الاذکار ۱۶۲،الفتوحات الربانية ۴/۲۹۳)

মীযাবে রহমত :

তাবারী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত আছে, মীযাবে রহমতের সামনে যে দু'আ-ই করা হয় তা কবুল হয়। হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, আখয়ারের মুসল্লার পাশে নামায পড়ো এবং নেকীর পানি পান করো। জিজ্ঞেস করা হলো, আখয়ার এর মুসল্লা কোনটি? উত্তরে বললেন, মীযাবে রহমতের নিচে। প্রশ্ন করা হলো, পুণ্যময় শরাব কী? উত্তরে বলেন, যমযমের পানি।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মীযাবে রহমতের নিচে নামায আদায় করতেন। (হেদায়াতুস সালেক ১/৭৮)

সাঈ আরম্ভ করার সময় :

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাঈর জন্য সাফা পাহাড়ে আরোহন করার সময় এই দু'আ পড়তেন–

اِن الصّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ اَبْدَأُبِمَا بَدَأَ اللهُ عَزّوَجَلّ بِه

মারওয়া পাহাড়ে উঠে কেবলামুখী হয়ে তাহলীল ও তাকবীর বলার পর এই দু'আ পড়তেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَوَعْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ (سنن کبری ۵/۹۳)

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সাফা পাহাড়ে চড়ে এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اَحْیِیْنِیْ عَلٰی سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَتَوَفَّنِیْ عَلٰی مِلَّتِه وَاَعِذْنِیْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

(هداية السالک ۲/۸۷۷)

উল্লেখ্য, সাফা মারওয়ায় যে দু'আই করা

হয় তা কবুল হয়। তাই বর্ণিত দু'আ ব্যতীতও কায়মনোবাক্যে নিজের বিভিন্ন হাজাতের দু'আ করা উচিত।

মরওয়া পাহাড়ে :

সাফা পাহাড়ে যে সকল দু'আর কথা বলা হয়েছে সেগুলো মারওয়াতেও পড়া যাবে।

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি হজের সময় (তাওয়াফের পর) বাবে সাফা দিয়ে বের হলেন। সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যখন কাবা শরীফের দিকে নজর পড়ল তখন এই দু'আ তিন বার পড়ে অন্যান্য দু'আ করলেন। মারওয়াতে গিয়েও সেরূপ করলেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَه (الفتوحات الربانية ٤/٣٩٧)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) সাফা পাহাড়ে ওঠার পর বাইতুল্লাহ যখন নজরে পড়ল তখন এই দু'আ তিন বার পাঠ করলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (سنن كبرىٰ ٥/٩٤٣)

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাফা পাহাড়ে ওঠার পর এই দু'আ পড়তেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لِهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِىْ بِدِيْنِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ نَبِيِّكَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِىْ حُدُوْدَكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتِكَ وَاَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ نِىْ لِلْيُسْرٰى وَجَنِّبْنِى الْعُسْرٰى وَاغْفِرْلِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِى يَوْمَ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْدِمْنِى لِتَعْذِيْبٍ وَلَا تُؤَخِّرْنِىْ لِسَوْءِ الْفِتَنِ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (الفتوحات الربانية ٤/٤٠٠)

মু'আত্তার বর্ণনা হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক সাফা পাহাড়ে এই দু'আ পড়ার কথা আছে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ اِلَى الْاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ (حصن ٢٩٩، بيهقى ٥/٩٤)

ইমাম নববী (রা.) সাফা মারওয়ায় পড়ার জন্য এই দু'আর কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে রাসূল (সা.) ও হযরাত সাহাবায়ে কেরাম থেকে স্বীকৃত উভয় দু'আ বিদ্যমান।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْلَانَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ،اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ ادْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِى لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ (الاذكار ٢/١٦٧)

সাঈ করার সময় :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সাঈ করার সময় সাফা পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে আল্লাহর হামদ ও দু'আতে নিমগ্ন ছিলেন। (বায়হাকী ৫/৯৩)

মীলাইনে আখযারাইনের দু'আ :

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মীলাইনে আখযারাইনের মাঝামাঝি (বর্তমানে সেখানে সবুজ দাগ রায়েছে) এই দু'আ পড়তেন।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ فَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ (ابن ابى شيبة رقم الحديث ٢٩٥)

সাঈর মাঝামাঝি :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাঈর মাঝামাঝি পৌঁছতেন (অর্থাৎ মীলাইনে আখযারাইন) তখন এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ (الدعا ٢/١٢٠٣)

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) সাঈর সময় এই দু'আ পড়তেন :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِى السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ (الفتوحات الربانية ٤/٤٠٢)

মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার সময় :

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, মক্কা থেকে মিনা যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ اَرْجُوْ وَلَكَ اَدْعُو فَبَلِّغْنِىْ صَالِحَ اَمَلِىْ وَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى اَهْلِ طَاعَتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

(الاذكار ١٢٨)

মিনা থেকে আরাফা যাওয়ার প্রাক্কালে :

ইমাম নববী (রহ.) লেখেন, মিনা থেকে আরফা যাওয়ার প্রাক্কালে এই দু'আ পড়া। তিনি আরো লেখেন, মিনা থেকে আরফা যাওয়ার পথে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ দরূদ এবং বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَجْهَكَ الْكَرِيْمَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوراً وَحَجِّيْ مَبْرُوراً وَارْحَمْنِيْ وَلَاتُخَيِّبْنِيْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (الاذكار ١٢٨)

হাজীদের জন্য একটি সাধারণ দু'আ :

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি মামুলি ধরনের বাহন এবং কিছু কম দামি কাপড় (যার মূল্য ৪ দিরহাম থেকেও কম হবে) দিয়ে হজ করেন এবং এই দু'আ পাঠ করেন।

اَللّٰهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ (ابن ماجه ٢/١٢١)

আরফা :

আরাফা হলো দু'আ কবুল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সময়। তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে কায়মনোবাক্যে যথাসম্ভব বেশি বেশি দু'আ করা জরুরি। নিচে এমন কিছু দু'আ উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলো রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন সময় আরফার ময়দানে অত্যন্ত মনোনিবেশ ও অশ্রুসজল নয়নে পাঠ করেছিলেন :

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হজ্জাতুল বিদার সময় আরাফার দু'আসমূহে রাসূল (সা.) এর দু'আ এটি :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِيْ وَتَرٰى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ اَمْرِيْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَشَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَذَلَّ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغِمَ اَنْفُهُ لَكَ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ بِيْ رَؤُفاً رَحِيْماً يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ (سبل الهدى ٨/٤٧١، الدعاء ٢/١٢٠٨)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে লোক আরফার দিন সূর্য ঢলার পর এই দশ কালেমা এক হাজার বার পড়বে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন। তবে আত্মীয়তা ছিন্ন করা ও গুনাহের কোনো প্রার্থনা যেন না করে।

سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْاَرْضِ مَوْطِئُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْقُبُوْرِ قَضَاءُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ فِي الْهَوَاءِ رُوْحُهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ، سُبْحَانَ الَّذِيْ وَضَعَ الْاَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا مَنْجَا مِنْهُ اِلَّا اِلَيْهِ

(الدعا ٢/١٢٠٧)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফার ময়দানে প্রায় সময় এই দু'আ পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَاِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْاَمْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ

(هداية السالك ٣/١٠٢، الاذكار ٢١٩)

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আরাফায় আসরের নামাযের পর হাত উঠিয়ে এই দু'আ করা। এর পর হাত নামিয়ে সূরায়ে ফাতিহা পরিমাণ খামোশ থাকা। এর পর আবার এই দু'আ পাঠ করা।

اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِيْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى (ابن ابى شيبه، حصن ٢٩٧)

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার পূর্বের প্রায় নবীগণের এবং আমার আরাফার দু'আ হলো এই –

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَفِيْ صَدْرِيْ نُوراً وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْراً، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدُوْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ

مَرْحُومًا مُسْتَجَابَ الدُّعَاءِ فَائِزاً بِالْقَبُولِ وَالرِّضْوَانِ وَالتَّجَاوُزِ وَالْغُفْرَانِ وَالرِّزْقِ الْحَلَالِ الْوَاسِعِ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ وَمَا اَرْجِعُ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلٍ وَمَالٍ (هداية السالک۲/۱۰۳۸)

মুযদালিফায় যাওয়ার সময় :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেন এর পর মুযদালিফায় তাশরিফ নিয়ে যান। এতে সব সময় তাকবীর, তাহলীল, তা'যীম এবং তাহমীদে নিমগ্ন থাকেন।

ইমাম নববী (রহ.) মুযদালিফায় যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهَ وَاللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اَرْغَبُ وَاِيَّاكَ اَرْجُوْ فَتَقَبَّلْ نُسُكِيْ وَوَفِّقْنِيْ وَارْزُقْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ اَكْثَرَ مَا اَطْلُبُ وَلَا تُخَيِّبْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ اللهُ اَلْجَوَّادُ الْكَرِيْم

(اذکار۱۷۰)

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, আরফা থেকে মুযদালিফায় তালবিয়া, তাহলীল এবং এই দু'আ পাঠ করা অবস্থায় যাওয়া।

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَفَضْتُ وَاِلَيْكَ رَغِبْتُ وَمِنْكَ رَهِبْتُ فَاقْبَلْ نُسُكِيْ وَاَعْظِمْ اَجْرِيْ، وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَاسْتَجِبْ دُعَائِيْ وَاَعْطِنِيْ سُؤْلِي (هداية السالک۳/۱۰۳۹)

মুযদালিফার রাত :

মুযদালিফার রাত বড়ই ফযীলতপূর্ণ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। যিকির, তালবিয়া, কুরআন তিলাওয়াত এবং অতঃপর অনুচ্চস্বরে এই দু'আ পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ رِزْقاً طَيِّباً مُبَارَكاً اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْاِجَابَةِ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَااَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ اِلَيْنَا وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكَرِّهْهُ اِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ وَلَا تَنْزِعْ مِنّا الْاِ سْلَامَ بَعْدَ اِذْا اَعْطَيْتَنَا هُ (الدعاء۲/۲۰۸،هداية السالک۲/۱۰۲۵)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরাফার দিন রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের দু'আ ছিল এটি :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوانِي على النَّاسِ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلى مَنْ تَكِلُنِي إِلى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ تَكُنْ ساخِطاً عَلَيَّ فلا أُبالِي غَيْرَ أَنَّ عافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الكَرِيمِ الَّذِي أضاءَتْ لَهُ السَّمواتُ والأَرْضُ وأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُماتُ وصَلَحَ عليهِ أَمْرُ الدُّنْيا والآخِرَةِ أَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ أَوْ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَلَكَ العُتْبى حَتَّى تَرْضى ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ (كنزالعمال۲/۱۷۵)

আরাফা থেকে প্রস্থান করার সময় এই দু'আ পড়বে এরপর দরুদ শরীফ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذا آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هٰذا الْمَوْقِفِ وَاجْعَلْنِيْ فِيْهِ مُفْلِحاً وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِيْ النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهَبُّ بِهِ الرِّيَاحُ،وَمِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ (بيهقى ۵/۱۱۷،سبل الهدى ۸/۴۷۱)

আরাফার দিনের কিছু দু'আয়ে মাছূরা :

হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে আরাফার দিন যাওয়ালের পর এই আমল করবে তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, হে ফেরেশতাগণ সাক্ষী থাকো আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করলাম।

আমলটি হলো, একশত বার সূরায়ে ফাতেহা পড়া এর পর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করা :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد

এরপর এই দু'আ একশতবার পাঠ করা।

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر (القول البديع ۱۹۹)

অথবা এই দু'আ পড়া :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (بيهقى ۳/۱۳۶۸،القول البديع۲۰۰،هداية السالک ۲/۱۰۲۷)

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আরাফার দিন যাওয়ালের পর উচ্চ স্বরে এই এই দু'আ পড়তেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدٰى وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلَنَا فِيْ الْآخِرَةِ وَالْاُوْلٰى

দু'আর মাধ্যমে এই রাত যাপন করা জরুরি। (হেদায়াতুস সালেক ১০৫৮)

ইমাম নববী (রহ.) মুযদালিফায় এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ كَمَا وَقَفْتَنَا فِيْهِ وَاَرَيْتَنَا اِيَّاهُ فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الضَّالِّيْنَ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰه غَفُوْرٌرَحِيْمٌ،رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْكَمَالُ كُلُّهُ وَلَكَ الْجَلَالُ كُلُّهُ وَلَكَ التَّقْدِيْسُ كُلُّهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جَمِيْعَ مَااَسْلَفْتُهُ وَاعْصِمْنِيْ فِيْمَا بَقِيَ وَارْزُقْنِيْ عَمَلاً صَالِحاً تَرْضٰى به عَنِّي يَا ذَاالْفَضْلِ الْعَظِيْم،اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَشْفِعُ اِلَيْكَ بِخَوَاصِّ عِبَادِكَ اَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَيْكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْزُقْنِيْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلَّهُ وَاَنْ تَمُنَّ عَلى بِمَا مَنَنْتَ به عَلى اَوْلِيَائِكَ وَاَنْ تُصْلِحَ حَالِيْ فِيْ الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا يَاآرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(اذكار ١٧١)

মুযদালিফার রাতের দু'আ হিসেবে আল্লামা নববী (রহ.) এই দু'আটিও বর্ণনা করেছেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِيْ فِي هٰذا الْمَكَانِ جَوامِعَ الْخَيْرِ كُلَّهُ وَاَنْ تُصْلِحَ شَانِيْ كُلَّهُ وَاَنْ تَصْرِفَ عَنِّي الشَّرَّ كُلَّهُ فَاِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُكَ وَلَا يَجُوْدُ بِهِ اِلَّا اَنْتَ (الاذكار ١٧١،هداية السالك٣/١٠٨٥)

মুযদালিফা থেকে মিনা :

ইমাম নববী (রহ.) লেখেন, মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব : অনেকে মিনায় গিয়ে এই দু'আ পড়ার কথা বলেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَلَّغَنِيْهَا سَالِماً مُعَافِيً اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنّٰى قَدْ اَتَيْتُهَا وَاَنَا عَبْدُكَ وَفِيْ قَبْضَتِكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ به عَلٰى اَوْلِيَائِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحِرْمَانِ وَالْمُصِيْبَةِ فِيْ دِيْنِيْ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (اذكار ٢٣٤،هداية السالك ٣/١٠٩٣، المناسك ١٠٩٢)

ইযযুদ্দীন ইবনে জামাআহ মুযদালিফা থেকে রওনা দিয়ে এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَفَضْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ اَشْفَقْتُ وَاِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَمِنْكَ رَهِبْتُ فَاقْبَلْ نُسُكِيْ وَاَعْظِمْ اَجْرِي وَارْحَمْ تَضَرُّعِيْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَاَعْطِنِيْ سُؤْلِي وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَآلِه وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ (هداية السالك ٣/١٠٧٦)

জামরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপ :

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জামরায়ে উকবার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় প্রত্যেকবার তাকবীর বলতেন। (আল ফুতুহাত ৫/১৯)

হযরত ইবনে মসউদ (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জামরায়ে উকবার রমী করার সময় এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً (ابن ابى شيبه ١٠/٣٧٢،حصن ٢٩٩)

মুহীত গ্রন্থের লেখক এই দু'আ পড়তে বলেন–

بسم الله والله اكبر رغما للشيطان وحزبه (هداية السالك٣/١١١٢)

হযরত আলী (রা.) প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপে 'আল্লাহু আকবার' বলার পর এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى وَقَوِّنِيْ بِالتُّقٰى وَاجْعَلِ الْآخِرَةَ خَيْراً لِيْ مِنَ الْاُوْلٰى

(هداية السالك ٣/١١١٢)

উত্তম হলো, প্রত্যেক রমীর পর তাকবীর বলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর দু'আটি পাঠ করা।

আইয়ামে তাশরীক :

ইমাম যুহরী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আইয়ামে তাশরীকের রমী প্রতিদিন সূর্য ঢলার পরে করতেন। প্রত্যেক জামরাতে সাত কঙ্কর মারতেন এবং তাকবীর বলতেন, জামরায়ে উলা ও জামরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ দুআ ও কান্নাকাটি করতেন, তৃতীয় রমীর পর দু'আ করতেন না।

হযরত ইবনে উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জামরায়ে উলায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রত্যেক কঙ্কর মারার সময় তাকবীর বলতেন, এরপর কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। এরপর জামরায়ে উস্তার রমী করতেন। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতেন। পরে জামরায়ে উকবার রমী করতেন, সেখানে দাঁড়াতেন না। (বুখারী ২৩৬)

মোট কথা হলো, জামরায়ে উলা ও জামরায়ে উস্তায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ দু'আ করা সুন্নাত।

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে আছে যে, তিনি এই দুই জামরায় এতক্ষণ দু'আ করতেন যতক্ষণে সূরায়ে বাকারা শেষ করা যায়। (আল ফুতুহাত ২৬)

ইমাম নববী (রহ.) লেখেন, কায়মনোবাক্যে এই দু'আ পড়া :

اَللهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا اِيْمَاناً وَيَقِيْناً وَتَوْفِيقاً وَعَوْنًا وَاغْفِرْلَنَا وَلِآبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ (الاذكار ٢٣٤)

মাথা মুণ্ডণ বা চুল ছাঁটার পর :

হলকের পর তাকবীর বলা মুস্তাহাব। ইবনে জামাআহ বর্ণনা করেন, হলকের পর সলফ থেকে এই দু'আ পড়ার স্বীকৃতি পাওয়া যায় ।

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَاغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَتَقَبَّلْ مِنِّى عَمَلِىْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (هداية السالك ٣/١١٥٩)

তাওয়াফে বেদার সময় :

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) বলেন, বাইতুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফের সময় মুলতাযিমের পাশে এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَقَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ (الدعاء ٢/١٢١٠)

হযরত ইবরাহীম (রহ.) আব্দুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা যখন মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার ইচ্ছা করো তবে (বিদায় তাওয়াফের) সাত চক্কর পূর্ণ করে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায আদায় করো এবং হাজরে আসওয়াদ ও কাবা শরীফের দরজার মাঝখানে তথা মুলতাযিমে এই দু'আ পাঠ করো।

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ حَمَلْتَنِىْ عَلٰى دَابَّتِكَ وَسَيَّرْتَنِىْ فِىْ بِلَادِكَ حَتّٰى اَدْخَلْتَنِىْ حَرَمَكَ وَاَمْنَكَ وَهٰذَا بَيْتُكَ وَقَدْ رَجَوْتُكَ رَبِّ فِيْهِ بِحُسْنِ ظَنِّىْ بِكَ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ غَفَرْتَ لِىْ وَاِنْ كُنْتَ رَبِّ غَفَرْتَ لِىْ فَازْدَدْ عَنِّى رِضاً وَقَرِّبْنِىْ اِلَيْكَ زُلَفاً وَاِنْ كُنْتَ رَبِّ لَمْ تَغْفِرْلِىْ فَمِنَ الْآنَ رَبِّ فَاغْفِرْلِىْ قَبْلَ اَنْ يَنَائِى عَنِّى بَيْتُكَ يَا رَبِّ هٰذَا اَوَانُ اِنْصِرَافِى اِنْ اَذِنْتَ لِىْ غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ وَلَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ يَارَبِّ وَلَا بِبَيْتِكَ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنَ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمَنْ اَمَامِىْ وَمِنْ وَرَائِىْ حَتّٰى تَقْدِمَنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ فَاذَا قَدِمْتَنِىْ رَبِّىْ فَلَا تَتَخَلِّ عَنِّى وَاكْفِنِىْ مُؤْنَةَ اَهْلِىْ وَمُؤْنَةَ خَلْقِكَ اِنَّكَ وَلِىِّ وَوَلِيُّهُمْ (الدعاء للطبرانى ٢/١٢١١، الفتوحات الالهيه ٥/٢٩)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৮

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

বায় ছরফ (মুদ্রা ব্যবসার) প্রকৃতি ও বাস্তবতা :

ছরফ আরবী শব্দ। আভিধানিকভাবে এর অনেক অর্থ পাওয়া যায়। যথা-

১. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা। ২. ফিরিয়ে নেওয়া। ৩. ছেড়ে দেওয়া। ৪. ব্যয় করা। ৫. অতিরিক্ত। ৬. তাওবা। ৭. সৌন্দর্য। ৮. হৈ-হুল্লোড় করা।

আকদে ছরফকে উক্ত নামে নামকরণ এ জন্য করা হয়, যেহেতু এতেও অতিরিক্ত অর্জন উদ্দেশ্য থাকে।

আবার অনেকের মতে যেহেতু স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে বিক্রির সময় পাল্লায় রাখলে এক প্রকারের শব্দ সৃষ্টি হয় তাই উক্ত ক্রয়-বিক্রয়কে বাঈ ছরফ বলা হয়। (ফতহুল ক্বদীর ৬/৩২১, কাশশাফুল কানা' ৩/২৫৩)

ফিকহী পরিভাষায় বাঈ ছরফ :

হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী মাযহাবত্রয়ে বাঈ ছরফ বলা হয় ছামানের বিনিময়ে ছামানের বেচা-বিক্রিকে। উভয়টা সমজাতীয় হোক বা ভিন্নজাতীয়। তবে এ ক্ষেত্রে ছামান দ্বারা প্রাকৃতিক ছামান তথা- স্বর্ণ, রৌপ্যই উদ্দেশ্য তা যে প্রকারেরই হোক না কেন। যথা- দিরহাম, দিনার বা স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার ইত্যাদি।

তাই বাঈ ছরফের বিনিময়দ্বয় বা একটা বিনিময় ছামানে উরফী তথা পারিভাষিক ছামান হয়, যথা- ব্যাংক নোট বা পয়সা তা হলে তাকে বাঈ ছরফ বলা যাবে না। এবং এর উপর বাঈ ছরফের বিধিবিধান আরোপিত হবে না।

বাঈ ছরফের সংজ্ঞায় আল্লামা হাছকফী (রহ.) লিখেন-

وشرعا بيع الثمن بالثمن اى ماخلق للثمنية ومنه المصوغ جنسا بجنس او بغير جنس (الدر المختار ٤٠٢/٧)

অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায় বাঈ ছরফ বলা হয়, ছামানকে ছামানের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়কে। এখানে ছামান থেকে প্রকৃতিগত ছামানই উদ্দেশ্য এবং এর দ্বারা তৈরীকৃত পণ্য। চাই সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হোক বা ভিন্নতার সাথে হোক।

আল্লামা মিরগীনানী (রহ.) লিখেন-

سواء كانا يتعينان كالمصوغ او لا يتعينان كالمضروب او يتعين احدهما ولا يتعين الآخر لاطلاق ماروينا ولانه ان كان يتعين ففيه شبهة التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضة اعتبارا للشبهة فى الربا (الهداية مع الفتح ٢٦١/٦)

অর্থাৎ বাঈ ছরফের বিনিময়দ্বয় নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হোক, যথা- স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা তৈরীকৃত প্লেট অথবা বিনিময়দ্বয় নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না ওই রকম হোক যথা- স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা বানানো মুদ্রা অথবা বাঈ ছরফের একটা বিনিময় নির্ধারণ করা দ্বারা নির্ধারিত হয় অপরটা নির্ধারিত হয় না, উল্লেখিত সবপ্রকার বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্ত। কেননা বাঈ ছরফসংক্রান্ত হাদীস মুতলাক (সাধারণ) এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য যেহেতু প্রকৃতিগত ছামান তাই এর দ্বারা তৈরীকৃত পণ্য নির্ধারণের মাধ্যমে নির্ধারিত হলেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সুতরাং সুদের সন্দেহের কারণে বাঈ ছরফের মধ্যে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ (নিয়ন্ত্রণ) অপরিহার্য করা হয়েছে।

আল্লামা নছফী (রহ.) লিখেন :

وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم والدنانير فيصح بيعها بجنسها متفاضلا والتبايع والاستقراض بما يروج عددا او وزنا او بهما ولا يتعين بالتعيين لكونها اثمانا (كنز الدقائق مع البحر ٣٣٥/٦)

অর্থাৎ ভেজাল যদি বেশি হয় তা হলে তা দিনার ও দিরহামের হুকুমে হবে না। সুতরাং ওইগুলোর সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত সহকারে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। এবং প্রথা অনুসারে ওইগুলোর ক্রয়-বিক্রয় ঋণের লেনদেন মাপ-গণনার ভিত্তিতে বৈধ হবে। তবে ওইগুলো নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারিত হবে না, কেননা ওইগুলো ছামান।

উক্ত বক্তব্যের ওপর আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) লিখেন-

قوله ولا يتعين بالتعيين لكونها اثمانا يعنى مادامت تروج لانها بالاصطلاح صارت اثمانا فما دام ذلك الاصطلاح موجودا لاتبطل الثمنية لقيام المقتضى- (المرجع السابق)

অর্থাৎ নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, যেহেতু ওইগুলো ছামান। এর অর্থ হলো- যতক্ষণ ওইগুলোর প্রচলন থাকবে। কেননা ওইগুলো ব্যবসায়ীদের পরিভাষায় ছামান হয়েছে তাই যতক্ষণ পরিভাষা বহাল থাকবে ওই দিরহাম ও দিনারগুলোর ছামানিয়্যাতও বহাল থাকবে।

সারমর্ম :

যদি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে ভেজালের পরিমাণ অতিরিক্ত হয় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য কম হয়, এবং ওইগুলোর প্রচলনও থাকে তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয় কম-বেশ করেও বৈধ। বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হলেও। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলো নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারিত হবে না। কেননা এগুলো ছামান তবে পারিভাষিক ছামান।

উক্ত বক্তব্য দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে

ودراهم وهى المعروفة بالنقدين او كانا مصوغين كالإقراط والاساور اوكانا تبرا وعبر الشافعية والحنابلة عن الثمن بالنقد فقالوا الصرف بيع النقد بالنقد من جنسه او غيره ارادوا بالنقد كذلك الذهب والفضة مسكوكين او مصوغين او تبرا والحكم فى المذاهب الثلاثة هو ان الذهب والفضة اذا بيعا بجنسها كذهب بذهب او فضة بفضة وجب الحلول والتماثل والتقابض الى قوله والتعريف السابق للصرف عند الائمة الثلاثة يفيدانه محصور فى الذهب والفضة الذين لايغلب عليهما الغش فاذا كانت الدراهم مغشوشة ورائجة او كان النقدمن الجانبين فلوسا رائجة لا يجرى فيهما حكم الصرف ـ (تطور النقود ١٤١–١٤٣)

অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মতে বাঈ ছরফের সংজ্ঞা হলো ছমনকে ছমনের বিনিময়ে বিক্রি করা। এবং তাদের মতে ছমন থেকে উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক ছমন অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে যা ছমন হিসেবে সাব্যস্ত, আর তা হলো, স্বর্ণ রৌপ্য চাই তা মুদ্রা আকারে হোক যথা- দিরহাম-দিনার যা নকদাইন হিসেবে প্রসিদ্ধ। অথবা অলংকার আকৃতিতে হোক। যথা- কানের দুল, হাতের চুড়ি অথবা তদ্বারা বানানো কোনো বস্তু ইত্যাদি।

শাফেয়ী, হাম্বলী ইমামগণ এ ক্ষেত্রে ছমন দ্বারা 'নকদ' আখ্যা দিয়েছেন। তাই তারা বলেন নকদের বিনিময়ে নকদের বাঈকে ছরফ বলা হয়। তার বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হোক বা না হোক। তাদের মতে ও নকদ থেকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যই উদ্দেশ্য। তা যে রূপেরই হোক না কেন।

এবং মাযহাবদ্বয়ে বিধান ও এক অভিন্ন। আর তা হলো, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় যখন সমজাতীয় এর বিনিময়ে হবে যথা- স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে অথবা রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে হবে তখন বিনিময়দ্বয় বাকি হতে পারবে না এবং উভয়টা সমান ক্রয়-বিক্রয়কে বাঈ ছরফ বলা হয়। চাই বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হোক বা ভিন্নজাতীয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বক্তব্য :

والثانية لايشترط الحلول والتقابض فان ذلك معتبر فى جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا او كان صرفا او كان مكسورا بخلاف الفلوس ولان الفلوس هى فى الاصل من باب الاعراض والثمنية عارضة لها ـ (مجموع الفتاوى ٢٩/٤٥٩)

অর্থাৎ দ্বিতীয় মত হলো এই যে তাৎক্ষণিক কব্জ এবং ক্যাশ পেমেন্ট জরুরি নয়। কেননা তা কেবল স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে পয়সা স্বর্ণ ও রৌপ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং পয়সা প্রকৃতপক্ষে পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। পয়সার মধ্যে ছমনিয়্যত বিশেষ্য অস্থায়ীভাবে আরোপিত। মূলত উপর্যুক্ত মত ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত। যার সারমর্ম হলো, বাঈ ছরফের জন্য প্রাকৃতিক ছমন হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লামা জুহাইলী লিখেন-

وشرعا هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنس او بغير جنس اى بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او الذهب بالفضة مصوغا او نقدا (الفقه الاسلامى وادلته (٤/٦٣٦)

অর্থাৎ শরীয়তে নকদের বিনিময়ে নকদের ক্রয়-বিক্রয়কে ছরফ বলা হয়। তা সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে হোক বা তার বিপরীতভাবে হোক। অর্থাৎ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে চাই তা মুদ্রা আকৃতিতে হোক বা অন্য কোনো তৈরি পণ্য আকৃতিতে হোক।

তাতাউরুন্নুকূদ গ্রন্থে উল্লেখিত-

عرف الحنفية الصرف بانه بيع الاثمان بعضها ببعض وارادوا من الاثمان ماكان ثمنا خلقة اى من القدم وهو الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين دنانير

যায় যে, উপর্যুক্ত বাঈ এর মধ্যে ছামানের বিনিময়ে ছামান। কিন্তু এই ছামান যেহেতু প্রাকৃতিক নয় তাই বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্তও নয়। এবং এতে বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত লেনদেনকে জায়েয বলা হয়েছে।

হানাফী ফকীহগণের উপরোল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাঈ ছরফ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ছমন হওয়া যথেষ্ট নয় বরং যেকোনো প্রকারের প্রাকৃতিক ছামান হতে হবে। তবে অনির্ধারিত হওয়ার জন্য শুধু ছমন হওয়ায় যথেষ্ট।

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব কাশশাফুল কানা' এ মধ্যে উল্লেখ আছে-

فصل فى المصارفة وهى بيع نقد بنقد اتحد الجنس او اختلف (كشاف القناع ٣/٢٥٣).

অর্থাৎ মুছারেফা বলা হয়, মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করাকে। এতে বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হোক বা না হোক।

হাম্বলী মাযহাবের ইমামরা যেহেতু তার ব্যাখ্যায় 'নাকদাইন' দ্বিবচন ব্যবহার করে থাকেন এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, দিরহাম, দিনার উল্লেখ করে থাকেন। তাই এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তাদের নিকটও বাঈ ছরফের মধ্যে 'নকদ' দ্বারা প্রাকৃতিক ছমনই উদ্দেশ্য।

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব মুগনীল মুহতাজে উল্লেখিত-

النقد بالنقد والمراد به الذهب والفضة مضروبان كان او غير مضروب (مغنى المحتاج ٢/٢٤)

অর্থাৎ বাঈ ছরফ নকদের বিনিময়ে নকদের ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হয়। এবং নকদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বপ্রকারের স্বর্ণ-রৌপ্য।

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে-

تنبيه : بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا ـ (المرجع السابق)

অর্থাৎ নকদের বিনিময়ে নকদের

সমান হতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কব্জ করা জরুরি হবে উভয়টার ওপর।

মাযহাবত্রয়ের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় যে, বাঈ ছরফ শুধুমাত্র ওই সব স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যাতে ভেজালের আধিক্য হবে না। সুতরাং যদি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মধ্যে ভেজালের আধিক্য হয় এবং তা নকদ হিসাবে প্রচলিত হয় তা হলে ওই চুক্তিকে বাঈ ছরফ বলা হবে না।

মালেকী মাযহাবে এ বিষয়ে তিনটা পরিভাষা প্রচলিত- ১. মুরাতালা। ২. মুবাদালা। ৩. ছরফ।

মুরাতালা বলা হয়- স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে অথবা রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে ওজন করে ক্রয়-বিক্রয় করাকে। তাই মুরাতালার মধ্যে বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হওয়া জরুরি।

মুবাদালা বলা হয়- মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে সংখ্যায় ক্রয়-বিক্রয় করাকে। যথা- দিনারকে দিনারের বিনিময়ে অথবা দিরহামকে-দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। এতেও বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হওয়া জরুরি।

ছরফ- স্বর্ণকে রৌপ্য বা রৌপ্যকে স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করাকে ছরফ বলা হয়। স্বর্ণ এবং রৌপ্য যে আকৃতিরই হোক এবং লেনদেন ওজন দ্বারা হোক বা গণনার মাধ্যমে হোক। (আকদুল জাওয়াহিরিচ্ছমনিয়্যাতি ২/৩৫১-৩৯৬)

বাঈ ছরফের শর্তসমূহ : (Conditions)

শরীয়তের দৃষ্টিতে বায় ছরফ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য চারটা শর্ত। যার মধ্যে দুটি শর্ত অস্তিত্বময় অর্থাৎ যা অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হয়। অপর দুটি অবিদ্যমান অর্থাৎ- না থাকা জরুরি।

অস্তিত্বময় শর্ত দুটি হলো- ১. ক্রেতা-বিক্রেতা বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ করা (Cash payment)। ২. বিনিময়দ্বয় সমপরিমাণ (Similitude) হওয়া।

অবিদ্যমান শর্তদ্বয়- যথা- ১. পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার শর্ত (Conditional option) না থাকা। ২. বিলম্বিতকরণ (Delaying) এর সুযোগ না থাকা।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো দুটি অর্থাৎ ১. ক্রেতা-বিক্রেতা বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ করা বা উভয়টি Cash payment হওয়া।

২. বিনিময়দ্বয় সমপরিমাণের হওয়া বা Similitude হওয়া। কেননা অবিদ্যমান শর্তদ্বয় এর ভিত্তি হলো প্রথম নং শর্তটাই, যা বিস্তারিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। বরং আরো চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বাঈ ছরফ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একটাই মাত্র শর্ত আর তা হলো বিনিময়দ্বয় সমপরিমাণের হওয়া। কেননা আরবী শব্দ تماثل বা مماثلت এর অর্থই হলো- সমতা। একটা বিনিময়ের ওপর যদি কব্জ হয় অপরটার ওপর কব্জ পাওয়া না যায় তা হলে বাহ্যত সমতা রক্ষা হলো না। বরং একটা অপরটার ওপর প্রাধান্য অর্জন করল।

আল্লামা মিরগীনানীর ভাষায় যা আরো পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়-

ثم لابد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولان احدهما ليس باولى من الآخر (هداية مع فتح القدير ٦/٢٦٠)

অর্থাৎ অতঃপর অপর বিনিময়টার ওপরও কব্জ করা জরুরি হবে, যাতে বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয় ও সুদ না আসে। এবং এ জন্য যে বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে যেহেতু একটা অপরটার ওপর অগ্রগণ্যও নয়।

জ্ঞাতব্য :

বাঈ ছরফ এবং সুদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ছরফ বাঈের অন্তর্ভুক্ত। তাতে বিনিময়দ্বয় সমজাতীয় হলে কোনো এক পক্ষের অতিরিক্ত তা পাওয়া গেলে বিরাল ফজল বা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে এবং বিনিময়দ্বয়ের কোনো এক পক্ষ বাকি হলে এতে বিলম্বজনিত সুদ পাওয়া যাবে।

বাঈ ছরফ Sale to change এর উপরোল্লেখিত শর্তসমূহের (Conditions) ব্যাখ্যা:

১। Possession আয়ত্ত করা।

অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা Contractors উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে চুক্তির মজলিশেই নিজ নিজ অধিকারের ওপর আয়ত্ত করা। ইসলামী শরীয়তে বাঈ ছরফ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এ শর্তটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকও বটে। যা বাঈ ছরফের সকল প্রকারে সর্বসম্মতভাবে অপরিহার্য। অর্থাৎ বাঈ ছরফের বিনিময়দ্বয় যে আকৃতিরই হোক না কেন যথা- মুদ্রার আকৃতি, অলংকার বা তৈরি পণ্যের আকৃতি ইত্যাদি। তদ্রূপ সমজাতীয়কে সমজাতীয়ের বিনিময়ে হোক বা ভিন্ন জাতীয়ের বিনিময়ে হোক উল্লেখিত সর্বাবস্থায় উপর্যুক্ত শর্ত পাওয়া যেতে হবে।

উক্ত শর্তটা অপরিহার্য হওয়ার কারণ :

যদি বাঈ ছরফের মধ্যে বিনিময়দ্বয়ের কোনো একটার ওপর ক্রেতা-বিক্রেতার তাৎক্ষণিক কব্জ পাওয়া না যায় তাহলে এটা ঋণের বিনিময়ে ঋণের লেনদেন হয়ে যাবে, যা ইসলামী শরীয়তে অবৈধ। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত-

اسحاق وابن شيبة والبزار عن ابن عمر نهى رسول الله ﷺ ان يباع كالئ بالكالئ يعنى دينا بدين زاد البزار وعن بيع عاجل باجل وعن بيع الغرر- (الدراية ١/١٥٧)

অর্থাৎ মহানবী (সা.) ঋণকে ঋণের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। মুসনাদে বাযযারের বর্ণনায় আরো উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) ঋণের বিনিময়ে ক্যাশ ক্রয়-বিক্রয় থেকেও নিষেধ করেছেন এবং বাঈ গরার থেকেও নিষেধ করেছেন।

আর যদি শুধু একটা বিনিময়ের ওপর কব্জ করা হয় অপরটা থাকে বাকি। তাহলে এমতাবস্থায় বিনিময়দ্বয়ের ক্ষেত্রে

সমতা থাকে না। অথচ বিনিময়দ্বয়ের ওপর সমতা অপরিহার্য।

এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইরশাদ-

الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد اوازداد فقد اربى فبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدابيد (كنز العمال رقم الحديث ٤٦٦٩)

অর্থাৎ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি কর, রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। গমকে গমের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। লবণকে লবণের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। জবকে জবের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। তবে কেউ যদি কোনো একদিকে অতিরিক্ততার সাথে বিক্রি করে তাহলে তা সুদ হবে।

স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে কমবেশ করেও বিক্রি করা যাবে, তবে হাতে হাতে হতে হবে। তদ্রূপ জবকে খেজুরের বিনিময়ে কম বেশ করে বিক্রি করা যাবে। তবে হাতে হাতে হতে হবে।

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا (مسلم)

অর্থাৎ, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো। যে কেউ এতে বৃদ্ধি করল বা অতিরিক্ত চাইল তা হবে সুদ।

عن ابن عمر ان عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والآخر ناجز (نصب الراية ٤/٥٦)

অর্থাৎ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করো এবং রৌপ্যকে স্বর্ণের সাথে এভাবে বিক্রি করো না যে তন্মধ্যে একটা ক্যাশ অপরটা বাকি।

জ্ঞাতব্য : বাঈ ছরফের মধ্যে উপর্যুক্ত শর্তের মর্মার্থ হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা আকদের মজলিশ থেকে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ে উভয়ের অধিকার হস্তগত করা। যথা বাঈ ছরফ সংঘটিত হওয়ার পর বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজ করার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একেকজন একেক দিকে চলে গেলে অথবা একজন চলে গেল অপরজন মজলিসে উপস্থিত থাকল এমতাবস্থায় উক্ত আকদ শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ক্রেতা-বিক্রেতা যদি একই মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং সেই উপস্থিতি অতি দীর্ঘায়িতও হয় এমনকি তথায় ঘুমিয়েও পড়ে অথবা আকদ হওয়ার পর কবজ করার পূর্বে উভয়ে একসাথে অন্যত্র চলেও যায় তা সত্ত্বেও আকদ বাতিল হবে না। বরং এর পরও যদি উভয়ে বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজ করে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাও বাঈ ছরফ হবে। (আল বাহরুর রায়েক ৬/৩২২, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/৬৩৭)

উপরোক্ত শর্তের গুরুত্ব :

বাঈ ছরফের মধ্যে উল্লিখিত শর্তের গুরুত্ব হযরত উমর (রা.) ও ইবনে উমর (রা.)-এর নিম্নে বর্ণিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়।

عن ابن عمر ان عمر قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائب والآخر ناجز وان استنظرك ان يلج بيته فلا تنظره الا يدا بيد هات وهات انى اخشى عليكم الربا (نصب الراية ٤/٥٦، فتح القدير ٦/٢٦١)

হযরত উমর (রা.) ইরশাদ করেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান ব্যতীত বিক্রি করো না এবং রৌপ্যকে স্বর্ণের বিনিময়ে এমনভাবে বিক্রি করো না যে, একটা ক্যাশ অপরটা বাকি এবং সে যদি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতিও তোমার কাছে চায় ততটুকু বিলম্বকরণের সুযোগও দিও না। বরং লেনদেন উভয়টা হাতে হাতে হতে হবে। এক হাতে নেওয়া, এক হাতে দেওয়া। আমি এতে সুদের ভয় করছি।

উপর্যুক্ত হাদীসে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত উমর (রা.) বাঈ ছরফের মধ্যে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করাকে কতটুকু গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি কব্জ না করে বা না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়াকেও না করেছেন। উক্ত শর্তের গুরুত্ব আরো বেশি প্রমাণিত হয় হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে-

عن ابن عمر انه قال وان وثب من سطح فثب معه (المرجع السابق)

অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেউ যদি ছাদ থেকে লাফ দেয়, তাহলে তুমিও এর সাথে লাফিয়ে পড়ো। যাতে মজলিশ এক থাকে।

উপর্যুক্ত শর্তের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা :

যেহেতু বাঈ ছরফের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কব্জ করা জরুরি তাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু মাসআলার বর্ণনাও নেহায়েত জরুরি।

১. ইবরা- তথা অব্যাহতি দেওয়া। ২. হেবা- উপহার বা অনুদান। ৩. সদকা। ৪. ইসতিবদাল বা পরিবর্তন করা। ৫. মুকাচ্ছাহ বা দেনা-পাওনা অ্যাডজাস্ট করা।

উল্লেখিত মাসআলাগুলোর বিশ্লেষণ :

১। ইবরা- অব্যাহতি দেওয়া Discharge। ২। হেবা। উপহার বা অনুদান Endwment। ৩। সদকা Charity।

উল্লেখিত তিনটা বিষয়ের বিধান একই। উদাহরণস্বরূপ, হাবিব, মাহবুব এর মধ্যে এক দিনারের বিনিময়ে এক দিনারের বায় ছরফ হলো, হাবিব চুক্তির মজলিশেই তার দিনার মাহবুবকে স্থানান্তর করল। এর দ্বারা হাবিব দায়মুক্ত হয়ে গেল। তবে মাহবুব এখনো হাবিবের নিকট তার দিনার হাস্তান্তর

করল না যার অর্থ হলো, মাহবুবের দায়িত্বে বর্তমানেও এক দিনার আদায় করা ওয়াজিব। ওই এক দিনারের অধিকারী হাবিব চুক্তির মজলিশেই মাহবুবকে বলল তোমার দায়িত্বে থাকা ওয়াজিব দিনারটা আমি তোমাকে হেবা করলাম অথবা সেটা আমি তোমাকে সদকা করলাম। অথবা আমি তোমাকে দায়মুক্ত করে দিলাম। বোঝা গেল উল্লেখিত কাজত্রয়ের সম্পর্ক হলো বাঈ ছরফের ছমনের সাথে অর্থাৎ ওই এক দিনার, যা মাহবুবের ওপর আদায় করা ওয়াজিব ছিলো।

উল্লেখিত মাসআলাত্রয়ের দুটি দিক :

১. যদি মাহবুব হাবিবের দেওয়া অফার গ্রহণ করে তা হলে মাহবুব দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে বাঈ ছরফ বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু এক পক্ষ থেকে কব্জ পাওয়া যায়নি।

২. যদি মাহবুব হাবিবের অফার গ্রহণ না করে ইবরা, হেবা, সদকা যা-ই করল সবটি বাতিল হয়ে যাবে তবে বাঈ ছরফ বহাল থাকবে। কেননা এ ক্ষেত্রে হাবিবের পক্ষ থেকে দেওয়া অফারগুলো ছরফ চুক্তিটা ভঙ্গ করার সামর্থ্য, তবে মাহবুব ওই অফারগুলো গ্রহণ না করাটা সে চুক্তি ভঙ্গের ওপর একমত নয় বলে বোঝা যাবে। এমতাবস্থায় মাহবুবও যদি তার ওপর ওয়াজিব হওয়া দিনার হাবিবকে দিয়ে দেয় এবং হাবিব তা কব্জ করে তা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বাঈ ছরফ হয়ে যাবে।

৪। ইসতিবদাল- পরিবর্তন করা Replacement

উল্লেখিত উদাহরণে মাহবুব যদি হাবিবকে দিনারের পরিবর্তে কাপড় প্রদান করে তাহলে এটাকে কব্জ বলা যাবে না। বরং মনে করা হবে যে, এখনো কব্জ পাওয়া যায়নি সুতরাং পরিবর্তন প্রক্রিয়াটা বাতিল হবে এবং বাঈ ছরফ যথাযথ বহাল থাকবে। যদি উভয়ে চুক্তির মজলিশ থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে হাবিবও মাহবুবের দিনারের ওপর কব্জ করে তাহলে ছরফ চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৫। মুকাচ্ছা বা দেনা-পাওনা Set off করা।

তা দুই প্রকারের ১. মুকাচ্ছা জবরিয়া- Compulsory Set off । ২. মুকাচ্ছা ইখতিয়ারিয়া- Voluntary Set off

উভয় প্রকারের ব্যাখ্যা:

১। Compulsory Set off বলা হয়, ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেনা-পাওনা Adjust হয়ে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ খালেদ হামেদের কাছে একশ দিনার ঋণ পায়। পরবর্তীতে খালেদের কাছে হামেদের অনুরূপ একশ দিনার কোনো লেনদেন সূত্রে এসে গেছে তাহলে উভয়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একে অপরের লেনদেন পরিশোধ হয়ে যাবে। এবং উভয়ে উভয়ের ঋণের দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে ক্লিয়ারিং এর উক্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য দুটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে।

১. যে দুজনের মধ্যে ক্লিয়ারিং হবে উভয়ে একে অপরের সাথে ঋণদাতা Creditor এবং ঋণগ্রহীতা Debtor এর সম্পর্ক থাকতে হবে। ২. উভয় ঋণ সমজাতীয়-একই প্রকারের এবং গুণ ও মানের মধ্যে সমান হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সমজাতীয় হওয়ার অর্থ, উভয়টা মুদ্রা হওয়া। একই প্রকারের হওয়ার অর্থ উভয়টি দিনার হওয়া। গুণ ও মান একই হওয়ার অর্থ উন্নত এবং অনুন্নতের মধ্যে সমতা থাকা। উভয় ঋণের পরিমাণ এক হওয়া জরুরি নয়।

২। Voluntary/ Optionaly Set off বলা হয় স্বত্বাধিকারীগণের পারস্পরিক সম্মতিতে সমন্বয় সাধিত লেনদেনকে। যেই লেনদেন ক্লিয়ার করণ সংঘটিত হয় স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে নিজের অধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ হালিম, আলিমের কাছ থেকে দশ দিনার পাওনা আবার আলিম হালিমের কাছে এক মণ গম পাওনা। এমতাবস্থায় উভয়েই নিজেদের পাওনা ও অধিকার ছেড়ে দেওয়ার ওপর সম্মত হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয। ক্লিয়ারিং বিষয়ের প্রাথমিক এই আলোচনার আলোকে মূল আলোচনা হলো, এই যে উদাহরণস্বরূপ আবেদ জাহেদকে এক দিনারের বিনিময়ে দশ দিরহাম বিক্রি করল তাহলে দশ দিরহাম আদায় করা আবেদের ওপর ওয়াজিব। এবং এক দিনার পরিশোধ করা জাহেদের ওপর ওয়াজিব। জাহেদ আবেদকে এক দিনার পরিশোধ করল। আবেদ এখনো দশ দিরহাম পরিশোধ করে নাই জাহেদকে। অন্য কোনো লেনদেনের ভিত্তিতে জাহেদের ওপর আবেদের দশ দিরহাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে উভয়ে পাওনা দেনা ক্লিয়ারিং করতে চায়। করার পদ্ধতি কী হবে?

এ ক্ষেত্রে তিনটা পদ্ধতি হতে পারে।

১. আবেদ জাহেদের কাছে বাঈ সরফের পূর্বে অন্য কোনো লেনদেনের কারণে দশ দেরহাম পাওনা হয়। তারা উভয়ে ইসতিহসানের ভিত্তিতে ক্লিয়ারিং করতে পারে। যদিও কিয়াসের ভিত্তিতে তা না জায়েয। কেননা উক্ত অবস্থায় এক পক্ষের বিনিময়ের ওপর কব্জ পাওয়া যায়নি। এই ক্লিয়ারিংটা হবে Optionaly Set off। যদিও উভয়ে এর ওপর সম্মত হয়েছে।

২. জাহেদের ওপর আবেদের দশ দিরহাম আকদে ছরফের পরে অন্য কোনো কবজের ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়েছে (কবজে মজমুন তথা যারদ্বারা 'জেমান' জরিমানা ওয়াজিব হয়)। যথা গসবের কব্জ। তখন ক্লিয়ারিং হবে বাধ্যতামূলক বা جبری مقاصة।

৩. জাহেদের ওপর আবেদের দশ দিরহাম ওয়াজিব হয়েছে বাঈ ছরফের পরে অন্য কোনো আকদের কারণে, এমতাবস্থায় উভয়ের সম্মতিতে স্বেচ্ছায় এটিও ক্লিয়ারিং (মুকাসসা) হতে পারে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মাধ্যমে
তাবলীগি কাজের সূচনা-৬

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

তাবলীগ জামা'আতের বদৌলতে বিশ্বে ইসলাম প্রসারের গতি

তাবলীগ জামা'আতের কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ইউরোপে হেদায়েতের হাওয়া চালিয়ে দিয়েছেন

হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলেন, প্রথম প্রথম ইউরোপে কিছু তাবলীগি জামা'আত গিয়েছিল, তাদের সাথে কিছু উলামাও ছিলেন। তাদের মেহনত ও ওয়াজে কিছুটা পরিবেশ তৈরি হলো। তাবলীগের সাথিরা এক শহর থেকে আরেক শহরে পায়দল গাশত করল, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের থাকার মতো কোনো

জায়গা ছিল না। কখনো কারো বাড়ির বারান্দায়, কারো বৈঠকখানায় সাময়িকভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা হতো। অনেক সময় এমনো হয়েছে যে, বাইরে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে, মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই নেই, তখন তারা ২-৩ জন করে টেলিফোন বুথে ঢুকে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। তাদের সেই অক্লান্ত মেহনত আর পরিশ্রমের কারণেই আজ এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, এটা এ কথার প্রমাণ যে, কেউ যখন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কাজ শুরু করে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের বারিধারা নেমে আসে।

তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কে আল্লাহ তা'আলা যে দরদ আর ব্যথা দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তো একাই পথ চলা শুরু করেছিলেন, তার সাথে কেউ ছিল না। কিন্তু পরে লোকেরা তার সাথে জুড়তে থাকল আর কাফেলা দিন দিন এত বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল যে, আজ সারা পৃথিবীতে এ রকম শত শত কাফেলা প্রতিটি মুহূর্তে গাশত করে ফিরছে। যাই হোক এই কঠিন পরিশ্রম বরদাশত করার পরে আল্লাহ তা'আলা ইউরোপে একটি অনুকূল পরিবেশ দান করলেন, সুতরাং দ্বীনের এই জামা'আত একেক এলাকায় গিয়ে সেখানকার লোকদেরকে ঈমান, একীন আর নামাযের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করল।

মানুষদের অন্তরে যখন ঈমান-একীন বদ্ধমূল হয়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই জানতে চাইবে যে, এখন আমাদের দায়িত্ব কী? তখন উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সহীহ ইসলামী যিন্দেগীর নমুনা শিক্ষা দেয়া, জরুরি মাসাআলা-মাসায়িল তাদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং কুরআনে কারীমের তা'লীমাত তাদের সামনে তুলে ধরা। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরাম সেখানে গিয়ে মাদ্রাসা কায়েম করলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এখনো সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমার ইংল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পথিমধ্যে ফ্রান্সে ২ দিন থাকতে হলো। ফ্রান্সের খোঁজখবর আমরা আগে থেকেই রাখতাম। এবার সেখানে গিয়ে সচক্ষে দেখতে পেলাম যে, সেখানকার দ্বীনি অবস্থা খুবই আশাব্যঞ্জক। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ইংল্যান্ডের চেয়েও বেশি। মসজিদের সংখ্যাও ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি। বাস্তবতা হলো, সেখানে ইসলাম এত দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করছে যে, প্রতিদিন গড়ে ২০ জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে।

ইসলামের বিস্ময়কর অগ্রগতি

ইংরেজ রচিত ইতিহাসে বারবার ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেছে। এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্য মুসলিম ঐতিহাসিকরা হাজারো চেষ্টা করা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন সকলের মনে বদ্ধমূল রয়ে গেছে যে, মুসলমানরা যখন কোনো

এলাকায় গমন করেছে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সামনে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেছে, হয় কুরআনকে মেনে নাও নয়তো জিযিয়া কবুল করো, এই দুটির কোনোটি না মানলে তোমাদের ফয়সালা তরবারীর দ্বারা হবে। এটা জানার পরে মানুষ মনে করে যে, ইসলাম হয়তো এই তৃতীয় পদ্ধতিতেই বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু তারা বোঝার চেষ্টা করে না যে, এই পদ্ধতিতে এত দ্রুত কিভাবে ইসলাম প্রসারিত হওয়া সম্ভব! ইসলামের অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে একজন প্রসিদ্ধ আলেম লিখেছেন-

ইসলামের অভ্যুদয়ের মাত্র ৮০ বছরের মধ্যেই একদিকে তার পতাকা হিন্দুস্তানে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমিতে তা পতপত করে উড়ছিল। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেছিলেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিজরত করেছিলেন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে। সেখান থেকেই ইসলামের প্রকৃত বিস্তার শুরু হয়েছিল। কিন্তু ৭০০ খ্রিস্টাব্দ আসতে আসতে মাত্র এই ৮০ বছরের মধ্যে ইসলাম ইরাক, ইরান এবং মধ্য এশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল আর

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা সিন্ধু বিজয় করেছিল। স্পেনেও ঠিক এই বছরই ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। হিজরী ১০০ বছর পুরা হতে না হতেই ৭২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের মতো শক্তিশালী রাজ্য পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয়টি আর ছিল না। ইতিহাসে রোমান সম্রাজ্যকে পরাশক্তি মনে করা হয়। কিন্তু সেটা অর্জন করতে তাদেরকে ছয় শত বছর ব্যয় করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে আরবদের বিশাল সম্রাজ্য মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে এই শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে যেখানে ৩৬৫টিরও বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে সেই তুলনায় ধর্মের সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলক কম। একটি জরিপ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে বড় বড় ৮টি ধর্ম রয়েছে। বিশ্বের ৯৫ শতাংশ মানুষ এর কোনো না কোনো একটির সাথে জড়িত। আর ৫ শতাংশ মানুষ জড়িত নাস্তিকতার সাথে। একটি আন্তর্জাতিক সাময়িকীর রিপোর্ট অনুযায়ী দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ ইসলামের অনুসারী। যাদের সংখ্যা ১৩০ কোটি। দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছে খ্রিস্টাব্দ ধর্মের অনুসারী। তাদের সংখ্যা ১০০ কোটি। তৃতীয় নম্বরে আছে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা। যাদের সংখ্যা ৯০ কোটি। চতুর্থ নম্বরে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। সংখ্যায় যারা ৩৬ কোটি। পঞ্চম নম্বরে আছে ইংল্যান্ডের গির্জার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। যাদের সংখ্যা ২৭ কোটি। ষষ্ঠ নম্বরে হচ্ছে শিখ। তাদের সংখ্যা ২৩ কোটি। সপ্তম নম্বরে ইহুদী সম্প্রদায়, যাদের সংখ্যা ১৪ কোটি। আর কোনো ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমন লোকদের সম্মিলিত সংখ্যা ৮৫ কোটি। আরো খুশির খবর হচ্ছে, ইসলাম সারা দুনিয়ায় খ্রিস্টবাদের তুলনায় ২১ শতাংশ হারে বিস্তার লাভ করছে। ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ান ইনসাইক্লোপিডিয়ার সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী ১৯৭০ সালে সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩.৭ বিলিয়ন, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৫.৩ শতাংশ ছিল। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৮৯ বিলিয়ন, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৯.৬ শতাংশ. ১৯৭০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ইসলাম বিস্তারের হার শতকরা ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের হার এই সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৭ থেকে ৩৩.৯ পর্যন্ত।

২০২৫ সাল নাগাদ সারা দুনিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা হবে প্রতি চারজনে একজন

ভারতের বহুল প্রচারিত মাসিক আর রেসালা ম্যাগাজিনে লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি রির্পোট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাইবেলের প্রকাশনা হ্রাস পেয়েছে আর কুরআনে কারীমের প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দশ বছর আগে বাইবেল ছিল সর্বোচ্চ বিক্রির তালিকায়, এখন সেই জায়গা দখল করেছে আল কুরআনুল করীম এবং বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ। ভারতের একটি বহুল প্রচলিত ম্যাগাজিনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের সংখা ছিল ১২০ কোটি আর খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ১৮০ কোটি। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩৫ শতাংশ আর খ্রিস্টানদের মাত্র ৪৭ শতাংশ। উক্ত রির্পোট অনুযায়ী, ২০২২ সাল নাগাদ মুসলমান আর খ্রিস্টানদের সংখ্যা বরাবর হয়ে যাবে। অতঃপর ২০২৫ সালে সারা দুনিয়ায় প্রতি চারজনের একজন হবে মুসলমান। অন্য এক রিপোর্ট অনুযায়ী দুনিয়ায় বসবাসরত মানুষের বেশির ভাগের সম্পর্ক ইসলামের সাথে। অতঃপর প্রতি পাঁচজনে একজন খ্রিস্টান এবং প্রতি ছয়জনে একজন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। আর প্রতি ১৪ জনের একজন বৌদ্ধ মতের অনুসারী এবং প্রত্যেক ২৬ জনের একজন ইহুদী।

দৈনিক ইনসাফ লাহোর। ১১/১১/২০০২

পাঁচ বছরে পাঁচ লাখ খ্রিস্টান গির্জার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ইংল্যান্ডে ইসলাম ধর্মের অগ্রগতি নিয়ে সাম্প্রতিক যে জরিপ চালানো হয়েছে তা খ্রিস্টধর্মের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিগত পাঁচ বছরে পাঁচ লাখ খ্রিস্টান গির্জা ত্যাগ করেছে। অন্যদিকে এই একই সময়ে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে ৩ লাখ। বর্তমান ব্রিটেনে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত সংখ্যার তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। বিগত পাঁচ বছরে সাড়ে সাতশত গির্জা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে এই একই সময়ে নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩১৪টি। এক জরিপে দেখা গেছে যে, ব্রিটেনে ১৫ লাখ মুসলমানের মধ্যে নওমুসলিমের সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে, আগামী ২০ বছরে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বর্তমানের ১৫ লাখ মুসলমানের সমপরিমাণ হয়ে যাবে।

জার্মানিতে ইসলাম প্রসারের গতি

পাশ্চাত্য মিডিয়া জগতের বৈরী প্রচারণা সত্ত্বেও ইউরোপে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে। এর অনুমান এই সমীক্ষা থেকে করা যায় যে, বর্তমানে জার্মানিতে ১৩টি ইসলামী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩২ হাজার। আর পুরা জার্মানিতে মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে ২০ লাখেরও বেশি।

মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্বেগ

বিগত কয়েক দশক ধরে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং পশ্চিমা জগত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তারা বলছে, ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার কারণে সারা দুনিয়া হুমকির মুখে। তাই তারা জনসংখ্যার হার কমানোর জন্য বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন রকমের উপদেশ খয়রাত দিচ্ছে। বিশেষভাবে মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এরা অনেক দানশীলতার (?) পরিচয় দিচ্ছে। এই প্রোগ্রামে সফল হওয়ার জন্য তারা বুলেট এবং ট্যাবলেট এই দুই ধরনের গুলি ব্যবহার করে আসছে। এতদসত্ত্বেও তারা মুসলমানদের জন্মহার কমাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদের অভিযোগ হচ্ছে, মুসলমান ফ্যামিলিগুলো

জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুব কমই সহযোগিতা করছে, যার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, বিগত দশক গুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্মহার যেখানে হ্রাস পেয়েছে, সেখানে মুসলমানদের জন্মহার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের তুলনায় রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে মারাত্মকভাবে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তাদের একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম তৈরি হয়ে যেতে পারে। এভাবে একদিন যদি আমেরিকায় মুসলিম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। একটি খ্রিস্টান প্রচারমাধ্যমের জরিপে এ কথা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে প্রতি তিন বছরে তাদের সংখ্যা ১ কোটি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্রুতগতিতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে সারা বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সম্মিলিত লোক সংখ্যার ১৬.৯৯৫ শতাংশ। কিন্তু মাত্র ৯ বছর পরে ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.৯৫৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৮৫ সালে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ৩২.৭৫২ শতাংশ। ৯ বছর পরে ১৯৯৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.২৪১ শতাংশ মাত্র। ১৯৮৫ সালে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ০.৩৬৪ শতাংশ। ১৯৯৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে ০.২৪৩ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৮৫ সালে হিন্দু মতাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ১৩.১০৫ শতাংশ। ১৯৯৪ সাল নাগাদ তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.৪৫৮ শতাংশে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে রয়েছে। কিন্তু ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা সমানগতিতে বৃদ্ধি পেতে রয়েছে। কনফুসিয়াস মতবাদের অনুসারীদের সংখ্যা ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ইহুদীদের ৪ শতাংশ আবাদী বিলুপ্ত হয়েছে। খ্রিস্টানদের বৃদ্ধি হয়েছে ৪৯ শতাংশ আর বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের বৃদ্ধির হার ৬৩ শতাংশ এবং হিন্দু ধর্মের বৃদ্ধির হার ১১৭ শতাংশ। কিন্তু এই একই সময়ে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৩৫ শতাংশ।

কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনের জরিপ অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে সারা বিশ্বের মুসলিম আবাদী ছিল ১.২০০ বিলিয়ন। জাতিসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর মুসলমানদের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২.৩ শতাংশ। তো মূল জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় মুসলমানদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এর তুলনায় খ্রিস্টানদের বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১.৪৫ শতাংশ। কমিউনিটি নিউজ গ্রান্ড ভিউজের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকায় ইসলাম এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি আর ইসলামের জনপ্রিয়তায় আমেরিকা, ইসরায়েল আর ভারত সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা পশ্চিমাদের "ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট" এই সস্তা স্লোগানে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় প্রজাদেরকে যখন এই টনিক গেলানোর চেষ্টা করছে তখন ঈমানদার দ্বীনদার মুসলমানরা কিন্তু এই স্লোগানকে এবং পলিসিকে সন্দেহের চোখে দেখছে। পশ্চিমাদের স্লোগান "ছোট খান্দান, জীবন আসান" এর মুকাবিলায় সাধারণ মুসলমানদের স্লোগান হচ্ছে "বড় খান্দান জিহাদ করা আসান"।

বাস্তব কথা হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোতে জনসাধারণের বড় এক অংশ জন্মনিয়ন্ত্রণের এই প্রচেষ্টার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করে না। মুসলিম দেশগুলোতে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা আমেরিকার অজানা নয়। তারা তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যাকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে অভিহিত করেছে। তাই তারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। এর মধ্যে রয়েছে, পরিকল্পিত গৃহযুদ্ধ, ইচ্ছাকৃত দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উস্কে দিয়ে পরস্পরে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া। আর জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রীর সহজলভ্যতা তো আছেই।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৫

তাদের সফলতা, আমাদের ব্যর্থতা :

লা-মাযহাবীদের সফলতা এখানেই যে, তারা তাদের সাধারণ লোকদেরকে আমাদের আলেমদের পেছনে লেলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের আলেমরা জনসম্মুখে কখনো আসতে চায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের সফলতার ঝুড়ি সম্পূর্ণ শূন্য। প্রত্যেক মসজিদে কয়েকজন এমন লোক তৈরি করা দরকার, যারা আমাদের পক্ষ হয়ে তাদের সাথে কথা বলবে। যাক, আমরা পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসি। আপনি ওই লোককে জিজ্ঞেস করুন, নামাযে সিনার ওপর হাত বাঁধার বিধান কী? এখন এই লোকটি সরাসরি তাদের আলেমের কাছে চলে যাবে। লোকটি যাওয়ার পর তাদের আলেমের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠবে। সে চিন্তা করবে, এই লোকটি তো ভ্রান্তদের জালে আটকা পড়েছে। কিন্তু লোকটির মাথায় অজস্র চিন্তা কিলবিল করছে। সে আবার আপনার কাছে এসে বলবে, নামাযে সিনার ওপর হাত বাঁধা সুন্নাত। এর প্রমাণ বুখারী শরীফেই আছে। কিন্তু লা-মাযহাবী আলেম তাকে বুখারী শরীফের পরিবর্তে 'সহীহ ইবনে খুযায়মা'র উদ্ধৃতি দেবে। এখানেই ঘটবে যত বিপত্তি। আপনার আর কিছু বলার কিংবা করার প্রয়োজন নেই। তার 'সবজান্তা'(!) আলেমের উত্তর শুনে চারটা বড় বড় প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলবে। এ বিষয়ে যদি আপনার কোনো জানাশোনাও থাকে, তাহলে আপনি তার হাতে একটি ফিরতি প্রশ্ন ধরিয়ে দিন। প্রশ্নটি হলো, আপনি আমাকে এমন একটা সহীহ, মারফু, মুত্তাসিল গায়রে মু'আরিজ (যে হাদীস অন্য হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়) হাদীস দেখান, যেখানে রাসূল (সা.) সিনার ওপর হাত বাঁধাকে সুন্নাত আখ্যা দিয়েছেন? অথবা ওয়াজিব কিংবা ফরয সাব্যস্ত করেছেন? স্পষ্ট কথা হচ্ছে, এর স্বপক্ষে সে কোনো প্রমাণই উপস্থাপন করতে পারবে না। কারণ, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতের যে শ্রেণীবিন্যাস, তা ফুক্বাহায়ে কেরামই আবিষ্কার করেছেন, নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে। যেমন, হাদীসের যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় সহীহ এবং যয়ীফ হিসেবে, তাও কিন্তু মুহাদ্দিসীনরাই আবিষ্কার করেছেন। সে যখন বলে, অমুক হাদীস সহীহ। আপনি তাকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করুন, অমুক হাদীস সহীহ, এ কথা রাসূল (সা.) কোথায় বলেছেন? স্মরণ রাখবেন, কোনো হাদীস সহীহ কিংবা যয়ীফ হয় না। বরং তা সনদ (বর্ণনাকারীদের ধারা পরম্পরা) দুর্বল কিংবা বিশুদ্ধ হতে পারে। সে যদি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, এসব পরিভাষা অস্বীকার করে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, হাদীস সহীহ, যয়ীফ, মুত্তাসিল, মরফু, মকতু, এসব পরিভাষা কোথায় পেলেন আপনারা? আমরা শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথা এবং নির্দেশ মানব। অন্য কারো নির্দেশ মানতে আমরা মোটেও প্রস্তুত নয়। হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোথায় করেছেন? তা একটু দয়া করে আমাদেরকে দেখান। এখন ওই সাধারণ লোকটি খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবে। আমরা তো তাদেরকে মুশরিক ধারণা করে তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতাম। কিন্তু এখন তারাই স্বীকার করছে, তারা আল্লাহ-রাসূল ছাড়া অন্য কারো কথা মানতে প্রস্তুত নয়। তারা তো মুশরিক হওয়ার কথা নয়। আর যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়েছিল, তাদেরকে তো আর বাটি চালান দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লা-মাযহাবী আলেমদের বদঅভ্যাস হচ্ছে, তারা অতি দ্রুত গালিগালাজ এবং ভর্ৎসনা করতে সিদ্ধহস্ত। অতি নিকটবর্তী এবং অন্তরঙ্গ সাথীদেরকেও ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট আখ্যা দিতে তাদের অন্তর একটুও কাঁপে না। এই লোকটি যখন উভয় দরবারে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করবে, এক দরবারে লা-মাযহাবী তীর্যক আর কটুবাক্যে জর্জরিত হবে এবং অন্য দরবারে (আপনার দরবারে) পাবে হৃদ্যতা এবং আন্তরিকতার পরশ, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার অন্তরে তাদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এবং আপনাদের সম্পর্কে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। এখন আপনি তাকে শরীয়তের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে চেষ্টা করুন। তার সামনে কিছু কমন দলিল-প্রমাণাদিও উপস্থাপন করুন। যেমন, আযান দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু রাসূল (সা.) নিজ জীবদ্দশায়ই কখনো আযান দেননি। এখন ধীরে ধীরে তার ব্রেইন ওয়াশ হয়ে যাবে। তার মস্তিষ্কে যে ধারণা বদ্ধমূল করে গেড়ে দেয়া হয়েছিল, যে কাজ রাসূল (সা.) স্বয়ং করেছেন, তাই সুন্নাত, এই ধরনের অপপ্রচারমূলক ভ্রান্তির অসাড়তা তার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। অথচ সুন্নাত বলা যে কাজ রাসূল (সা.) করেছেন। আবার কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। যে কাজ রাসূল (সা.) কখনো ছেড়ে দেননি তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হবে, অথবা ওয়াজিবের নিকটবর্তী হবে। এভাবে তার যোগ্যতা অনুযায়ী শরীয়তের কমন বিষয়গুলো তার সামনে প্রমাণ সহকারে তুলে ধরুন, যেন সে আপনার পক্ষ হয়ে বিরোধী পক্ষের সাথে কথা বলতে পারে। এভাবে যদি বুদ্ধিমত্তা এবং আন্তরিকতার সাথে তাদের ওপর মেহনত প্রচেষ্টা চালানো যায়, তাহলে তারা যে ভুল পথের ওপর আছে, তা তাদের সামনে অতি দ্রুত দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৪

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

শুধু চার মাযহাব মানব কেন?

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন-

The Islamic world has produced several learned Islamic scholars (Imams), but out of these, four became more famous and their teachings spread in different parts of the world.

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki. There is no proof whatsoever in the Qur'an or any authentic Hadith that a Muslim should only follow one of these four Imams.

বিশ্ব অনেক বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার বা ইমামদের জন্ম দিয়েছে এবং তাঁদের মাঝে চারজন বিখ্যাত হয়েছেন এবং তাঁদের শিক্ষা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এ চার মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, এগুলোর কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে।

অথচ কুরআন ও 'সহীহ' হাদীসের কোথাও নেই যে, চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করা উচিত।"

http://www.irf.net/index.php? option= com_content&view=a rticle&id=459%3 Awhich-school-of-thought- should-a-muslim-follow&catid= 76%3Aqueries-on-isl am-may-2011&Itemid =199

এটি সর্বজনবিদিত যে, সাহাবী, তাবেয়ী, এবং তাবে তাবেঈর যুগে মুসলিম বিশ্বে অনেক বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসীন ছিলেন। যাদের এক একজনই পৃথক পৃথক মাযহাবের ইমাম হওয়ার যোগ্য ছিলেন। মূলত ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, এ তিন যুগে ইসলামের বিজয় ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে চরম উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অতুলনীয় উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ইসলামী আইন শাস্ত্র তথা ফিকহ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সার কথা হলো, মুসলিম বিশ্বে যেমন চার ইমাম প্রসিদ্ধ, তেমনিভাবে অনেক ইমাম তাদের যুগে কিংবা তাদের পরবর্তী যুগে বর্তমান ছিলেন। তাহলে মুসলিম উম্মাহ কেন এ চার ইমামের কথাগুলোই গ্রহণ করল এবং অন্যান্য ইমামদের কথা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল? অর্থাৎ আমরা শুধু চার ইমামকেই মানব কেন?"

আল্লামা কুরাফী (রহ.) বলেন,

إن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأن مذاهبهم إنتشرت، و انبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها و تخصيص عامها و شروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما فى موضع وجد مكملا فى موضع آخر، و أما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا، لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير فى تقليده على غير ثقة بخلاف هؤلاء الأربعة.

"কেবল চার মাযহাবের কোনো একটির মাঝেই তাকলীদ সীমাবদ্ধ থাকবে। চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ বৈধ নয়। কেননা, চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলো এত ব্যাপক হয়েছে যে, এর সাধারণ বিষয়সমূহকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, আম (ব্যাপক) বিষয়সমূহকে খাস (সুনির্দিষ্ট) করা হয়েছে। এবং এর শাখাগত মাসআলা-মাসাইলকেও সুনির্ধারিত করা হয়েছে। কোনো স্থানে যদি কোনো একটি মাসআলা সাধারণ থাকে, তবে অন্য স্থানে বিষয়টির পরিপূরক বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে কেবল তাদের ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থেকে যায়, হয়তো ফতোয়াটির কোনো পরিপূরক, নির্দিষ্টকারক অথবা কোনো নির্ধারক রয়েছে, যদি তার অন্যান্য বক্তব্যসমূহকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হতো, তবে তা স্পষ্ট হতো। অতএব, এ ধরনের তাকলীদ বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়; কিন্তু চার মাযহাব এর ব্যতিক্রম। [মাওয়াহিবুল জালিল,১/৩০]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন-

قد نبهنا على علة المنع من ذلك -أى من تقليد غير الأئمة الأربعة-و هو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر و لم تنضبط فرب ما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه و ليس لمذاهبهم من يذب عنها و ينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة

"চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব অনুসরণের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তার কারণ হলো, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অনেক সময় তাদের দিকে এমন বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়, যা তারা বলেনি, তাদের পক্ষ থেকে

এমন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়, যা তারা উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি। আর তাদের মাযহাবসমূহ সংরক্ষণ এবং তাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হলে, তা সংশোধন করার কেউ অবশিষ্ট নেই; কিন্তু চার মাযহাব এর ব্যতিক্রম।

[আর রাদ্দু আলা মান ইত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবা', পৃষ্ঠা-৩৪]

"আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেছেন-

إنه يشترط فى تقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظا الشروط و المعتبرات؛ فقول الإمام السبكى :إن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ، ولم تعرف شروطه، و سائر معتبراته من المذاهب التى إنقطع حملتها و فقدت كتبها كمذهب الثورى و الأوزاعى و إبن أبى ليلى، و غيرهم

"চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব অনুসরণের জন্য শর্ত হলো, তাদের মাযহাবসমূহ লিপিবদ্ধ থাকা এবং মাযহাবের শর্তসমূহ ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা সংরক্ষিত থাকা। আল্লামা সুবকি (রহ.) যে বলেছেন, "চার মাযহাবের বিরোধীতার অর্থ হলো, ইজমার বিরোধিতা করা" এ বক্তব্য সে সমস্ত মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো সংরক্ষিত নয়, যার শর্তসমূহ এবং অন্যান্য নীতিমালা অজানা। এ সমস্ত মাযহাবের কোনো অনুসারী বর্তমানে অবশিষ্ট নেই এবং তাদের মাযহাবের ওপর লিখিত কোনো
কিতাবও পাওয়া যায় না। যেমন সুফিয়ান সাউরী (রহ.), ইমাম আওযায়ী (রহ.) ও ইবনে আবী লাইলা (রহ.)সহ অন্যদের মাযহাব।"

[বুলুগুল মুরাম, পৃষ্ঠা-১৮]

সুন্নি তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হলো, পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম জামা'আত। আর চার মাযহাব হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহ.) লিখেছেন-

مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم من أهل السنة و الجماعة

"চার মাযহাব এবং অন্য ইমামগণের মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।"

[উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৩]

"শায়খ আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.) লিখেছেন,

و أما تقليد مذهب من مذاهب الآن غير المذاهب الأربعة، فلا يجوز لا لنقصان فى مذاهبهم ، ورجحان المذاهب الأربعة عليهم، لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأئمة، بل لعدم تدوين مذاهبهم و عدم معرفتنا الآن بشروطها و قيودها و عدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر، حتى لو وصل إلينا شىء من ذلك كذلك جاز لنا تقليده، لكنه لم يصل كذلك

"চার মাযহাব ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয়; অন্য কোনো মাযহাবে ত্রুটি থাকা কিংবা চার মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে নয়। কেননা অন্যদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ রয়েছেন, যারা সমস্ত ইমামের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বরং অন্য কোনো মাযহাব আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মূল কারণ হলো, তাদের মাযহাব আমাদের নিকট সুবিন্যস্ত অবস্থায় পৌঁছেনি। তারা কোন্ কোন্ মূলনীতি (উসূল) এবং কোন্ কোন্ শর্তের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করেছেন, তা আমাদের অজানা। এবং তা আমাদের নিকট "তাওয়াতুরের" পদ্ধতিতে পৌঁছেনি। আমাদের নিকট যদি এভাবে তাদের কোনো মাসআলা পৌঁছে, তাহলে অবশ্যই তাদের অনুসরণ আমাদের জন্য বৈধ। কিন্তু মূলনীতিসহ আমাদের নিকট তাদের মাসআলা পৌঁছেনি।

[খোলাসাতুত তাহকীক ফি বায়ানি হুকমিত তাকলীদ ওয়াত তালফীক, পৃষ্ঠা, ৬৮-৬৯]

আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.)-এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, চার মাযহাব অনুসরণের অন্যতম কারণ হলো, চার মাযহাবের মূলনীতিসমূহ ও শাখাগত মাসআলা-মাসাইলগুলো সুবিন্যস্ত অবস্থায় বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। কিন্তু অন্য কোনো মাযহাবের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এ ছাড়া চার মাযহাব অনুসরণের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো-

১. প্রত্যেক মাযহাবের জন্য মূলনীতি থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ ফিকহের কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হলো, মাসআলাটি কোন্ উসূলের আলোকে রচিত। কোনো মত বা মাযহাবের সঠিকতার মাপকাঠি ওই মাযহাবের মূলনীতি বা উসুলে ফিকহ। যে মাযহাবের উসুলে ফিকহ যত শক্তিশালী সে মাযহাবের অনুসরণ ততটা গ্রহণযোগ্য।

২. চার মাযহাবে একজন মুমিনের জন্ম থেকে কবরের দাফন-কাফনসহ পরবর্তী যত মাসআলা আছে, সংশ্লিষ্ট সকল মাসআলার সমাধান রয়েছে। প্রত্যেকটি মাসআলা আলাদা অধ্যায়ে, সুনির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রয়েছে। একজন মুমিনের জীবন পরিচালনায় ইবাদাত, মু'আমালাত, মুআ'শারাত ও আখলাকিয়াত এক কথায় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ চার মাযহাবের প্রত্যেকটিতে রয়েছে। অন্য কোনো মাযহাবে যা পাওয়া সম্ভব নয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা : শামসুদ্দোহা

বগুড়া।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তির বসবাসের ঘর নেই, ঘর বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা জমা করেছে। ওই টাকার পরিমাণ হজের খরচের সমপরিমাণ হলে তার ওপর হজ ফরয হবে কি না?

সমাধান :

হ্যাঁ, হজের মৌসুম চলে এলে ওই টাকার কারণে হজ ফরয হয়ে যাবে। তবে মৌসুমের পূর্বেই ঘর নির্মাণে ব্যয় করে ফেললে হজ ফরয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬২)

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা : আব্দুর রহিম

কুড়িল, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ১.

জনৈক ব্যক্তি তার দোতলা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় বসবাস করে, দ্বিতীয় তলা প্রয়োজনাতিরিক্ত। এমতাবস্থায় তার ওপর দ্বিতীয় তলা বিক্রয় করে হজ করা জরুরি কি না?

সমাধান : ১.

দ্বিতীয় তলা বিক্রয় করে হজ করা তার জন্য জরুরি নয়, তবে উত্তম। (ফাতাওয়া কাযিখান ১/১৩৫, ফাতাওয়া দারুল উলুম ৬/৫৩৭)

প্রসঙ্গ : হজ

জিজ্ঞাসা :

মুহরিম ব্যক্তি অধিক পরিমাণ শৈত্যপ্রবাহের কারণে সারা রাত মাথা ঢেকে ঘুমিয়েছে। এমতাবস্থায় তার কী করণীয়?

সমাধান :

সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক অবধি পূর্ণ রাত ঠাণ্ডার ওজরের কারণে মাথা ঢেকে রাখলে একটি দম বা ৬ জন মিসকীনকে সাড়ে ১০ সের গম সদকা অথবা যেকোনো স্থানে তিনটি রোজা রাখার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে এর চেয়ে এক ঘণ্টা কম সময়ও যদি মাথা ঢাকা হয়, তবে পৌনে দুই সের গম একজন মিসকীনকে সদকা করতে হবে, অথবা একটি রোযা রেখে দিতে হবে। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৩/২২, রদ্দুল মুহতার ২/৫৫৮)

প্রসঙ্গ : কোরবানী

আব্দুর রহীম

বরিশাল।

জিজ্ঞাসা : একই বাড়ির দুই ব্যক্তি পৃথকভাবে দুটি গরু কোরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয় করে নিয়ে এসেছে। কোরবানীর দিন ভুলবশত একজন অপরজনের গরু দিয়ে কোরবানী করে ফেলে। প্রশ্ন হলো, তাদের কোরবানী সহীহ হয়েছে কি না?

সমাধান : যেহেতু ভুলবশত একে অপরের গরু দিয়ে কোরবানী করে ফেলেছে, তাই উভয়ের কোরবানী সহীহ হয়ে গেছে। (দুররুল মুখতার ২/২৩৪, রাদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯)

প্রসঙ্গ : ইহরাম

মুহা : কামরুজ্জামান

অলকার মোড়, রাজশাহী।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক বাংলাদেশি ব্যক্তি কোনো কোম্পানিতে চাকরির উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা করেছে। সে এহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে কি না?

সমাধান :

ওই ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই হজ বা ওমরার এহরাম ব্যতীত মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না। (বাদায়িউস সানায়ি' ৩/১৬০,ফাতাওয়া রহিমিয়া ৮/৩০১)

প্রসঙ্গ : ইহরাম

মাহবুব

সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা : ১.

বিমানে ওঠার পর স্মরণ হয় যে, তার ব্যাগে এহরামের কাপড় রয়ে গেছে। এখন তা নেয়া সম্ভব নয়। তাই পরিহিত জামা নিয়েই এহরাম করে ফেলে, তবে হাত বের করে নেয়। আর পায়জামা শরীরের সাথে লুঙ্গির ন্যায় পেঁচিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় তার এহরাম সহীহ হয়েছে কি না?

সমাধান : ১.

এমতাবস্থায় এহরাম করতে কোনো সমস্যা নেই। শর্ত হলো, জামায় বোতামও লাগাতে পারবে না। (আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৭/১১১, বাদায়িউস সানায়ে ৩/২০৬)

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা : আব্দুর রহীম

জিজ্ঞাসা : ২.
মুহরিম ব্যক্তির আতর ও ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার বিধান কী? ঘ্রাণ নিলে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে কি না?
সমাধান : ২.
মুহরিম ব্যক্তির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে আতর ও ফুল ইত্যাদির ঘ্রাণ মাখা মাকরূহ। তবে এর দ্বারা দম ওয়াজিব হবে না। (মুসান্নাফু ইবনে আবি শায়বা হা. ১৪৮৬৭, ফাতহুল ক্বাদির ৩/২২)
প্রসঙ্গ : কসম
নুরুল ইসলাম
মাইজদী, নোয়াখালী।
জিজ্ঞাসা : জনৈক ব্যক্তি কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, আমি অমুককে বিয়ে করব। পরবর্তীতে মনোমালিন্যের কারণে তার সাথে বিয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। তার এই প্রতিজ্ঞা পালন জরুরি কি না? এমতাবস্থায় বিয়ে না করলে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে কি না?
সমাধান : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথ করে থাকে তাহলে ওই মহিলাকে বিবাহ করা তার জন্য জরুরি, অন্যথায় শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে শপথবিহীন শুধু কুরআন হাতে নিয়ে উক্ত বাক্য উচ্চারণ করে থাকলে শপথ সংঘটিত হবে না বিধায় বিয়ে না করলে কাফফারাও দিতে হবে না। (রাদ্দুল মুহতার ৩/৭১৩, কাযি খাঁন ২/২৮৬)
প্রসঙ্গ : নামায
কামরুল ইসলাম
বাড্ডা, ঢাকা।
জিজ্ঞাসা : অনেক মসজিদে দেখা যায় মাগরিবের আযান ও নামাযের মাঝে বিলম্ব করে। এ রকম বিলম্ব করা শরীয়তসম্মত কি না?
সমাধান : মাগরিবের আযান ও একামতের মাঝে ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ বিলম্ব করা যাবে। বিনা কারণে এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করা মাকরূহ। (আদদুররুল মুখতার ১/৬১, বাদায়ে ১/৬৪৪)
প্রসঙ্গ : হজ
মাহমুদুল হাসান
বাহারদিয়া, চাঁদপুর।
জিজ্ঞাসা : ১.
জনৈকা মহিলার হজের এহরাম বাঁধার পর থেকে ১৩ ই যিলহজ পর্যন্ত ঋতুস্রাব হতে থাকে। উক্ত মহিলার হজের বিধান কী?
সমাধান : ১.
উক্ত মহিলা তাওয়াফ এবং সাঈ ব্যতীত হজের বাকি আমলগুলো আদায় করে নেবে এবং পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ এবং সাঈ আদায় করবে। (বুখারী ১/২২৩)
প্রসঙ্গ : উমরা
জিজ্ঞাসা : ২.
কোনো বাংলাদেশি রিয়াদে চাকরি করে। সরকারের অনুমতি ছাড়া ওমরাহ করায় ইমরাম বাঁধা ছাড়াই মিকাত অতিক্রম করে। অতঃপর এহরামের কাপড় পরিধান করে এবং নিয়ত করে ওমরাহর কাজ সম্পূর্ণ করে। জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তির ওমরাহ সহীহ হলো কি না?।
সমাধান : ২.
উক্ত ব্যক্তির ওমরাহ সহীহ হয়ে যাবে, তবে এহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম করার কারণে তার ওপর বকরি, ভেড়া বা দুম্বা কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। (আস সিরাজিয়াহ পৃ. ৩৪, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬২)
জিজ্ঞাসা : ৩.
মুহরিম ব্যক্তি ছারপোকা দূর করার জন্য তার বিছানাপত্র রোদে দিল, যার ফলে অনেক ছারপোকা মারা গেল। জানার বিষয় হলো, এ কারণে তার ওপর দম বা অন্য কোনো কিছু আসবে কি না?
সমাধান : ৩.
সে যদি ছারপোকাগুলো মারার উদ্দেশ্যেই বিছানাপত্র রোদে দিয়ে থাকে তাহলে তার ওপর জাযা আসবে অর্থাৎ পৌনে দুই সের গমের মূল্য সদকা করতে হবে। আর মেরে ফেলার উদ্দেশ্য না হলে জাযা আসবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৫৬৯, আল বাহরুর রায়িক্ব ৩/৬১)
প্রসঙ্গ : বদলি হজ
রিয়াজ হুসাইন
বারাকা, ওমান।
জিজ্ঞাসা :
কোনো ব্যক্তি খরচ পরে দেবে বলে তার পক্ষ থেকে বদলি হজের জন্য একজনকে পাঠাল। হজকারী হজ থেকে ফিরে এসে দেখতে পেল যে, নির্দেশদাতা মারা গেছে। তার ওয়ারিশদের কাছে হজের খরচ চাইলে তারা অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় ওই খরচ কে বহন করবে? এবং তার করণীয় কী?
সমাধান : বদলি হজের বিষয়টি কসম করে দাবি করলে ওই খরচ ওয়ারিশদেরকেই বহন করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৬১৩, ওমদাতুল ফিক্বহ ৪/৩৮৯)
প্রসঙ্গ : ওয়াকফ
মুহাম্মদ হাসান আলী
সিরাজগঞ্জ।
জিজ্ঞাসা : কেউ যদি মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করে এবং কাউকে মুতাওয়াল্লি না বানায় তবে মসজিদের মুতওয়াল্লি কে হবেন?

সমাধান : ওয়াকফকারী নিজেই মুতাওয়াল্লি বিবেচিত হবেন। আর তিনি চাইলে অন্য কাউকে মুতাওয়াল্লি বানাতে পারবেন। যদি তিনি জীবিত না থাকেন তবে মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্তে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত হবে। (দুররুল মুখতার ১/৩৭৮, রাদ্দুল মুহতার ৪/৪২১)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও. আব্দুস সালাম

ভৈরব, কমলাপুর, কিশোরগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা : আমাদের অল্প জায়গায় ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এখন মুসল্লী বেশি হওয়ার কারণে সম্প্রসারণেরও জায়গা হচ্ছে না। আর মসজিদ করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। কারণ মসজিদে দেওয়ার মতো আশপাশে কোনো জায়গা নেই। তাই মসজিদের জায়গা ওয়াকফকারী এই মসজিদের জায়গার পরিবর্তে অন্য স্থানে এর চেয়ে চার গুণ বেশি জায়গা দিতে চাচ্ছে। আর প্রথম মসজিদের জায়গার চেয়ে দ্বিতীয় মসজিদের জায়গার দামও অনেক বেশি এবং প্রথম মসজিদটি ভেঙে সেখানে ওয়াকফকারী নিজের বসবাসের ঘর বা দোকানপাট ইত্যাদি নির্মাণ করবে। আমার প্রশ্ন হলো, এমন এওয়াজ বদল জায়েয হবে কি না.

সমাধান : শরীয়তের বিধান মতে কোনো স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই স্থান কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায়। একমাত্র নদীগর্ভে বিলীন হওয়া ছাড়া ওই মসজিদ ত্যাগ করা, স্থানান্তর করা বা এওয়াজ বদলের মাধ্যমে তাতে বসতবাড়ি বা দোকানপাট ইত্যাদি করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই। বিধায় মসজিদকে আপন স্থানে বহাল রেখে প্রয়োজন মতো সম্প্রসারণ করা সম্ভব না হলে এলাকাবাসীর প্রয়োজনে তাদের সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় উভয় মসজিদ যথাযথভাবে আবাদ রাখা, আযান ও ইকামতসহ দুই মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায চালু রাখা এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। তবে পরামর্শক্রমে সুবিধামতো যেকোনো এক মসজিদে জুমু'আসহ পাঁচওয়াক্ত নামায ও অন্য মসজিদে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে কোনো আপত্তি থাকবে না। (ফতাওয়া তাতারখানিয়া ৫/৫৭২, দুররুল মুখতার ৩৭৯, ফতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪২৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ ও মাদরাসা ফান্ড

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

জিজ্ঞাসা : মসজিদের কাজে মিটিং করলে তাতে মসজিদের ফান্ড থেকে চা-নাস্তা খাওয়া, তদ্রূপ মাদ্রাসার মিটিংয়ে মাদরাসা ফান্ড থেকে চা-নাস্তা ইত্যাদিতে ব্যয় করা শরীয়তের আলোকে জায়েয আছে কি না?

সমাধান : মসজিদ-মাদরাসার ফান্ডে জমাকৃত চাঁদা শরয়ী দৃষ্টিকোণে কর্তৃপক্ষের ঘোষণা ও দাতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যয় করা জরুরি। এর বিপরীত করার অনুমতি নেই। মসজিদ-মাদরাসার মিটিংয়ের দ্বারা মাদরাসা-মসজিদের উপকার হলে উপস্থিত সদস্যদের চা-নাস্তা ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মাদরাসা মসজিদের চাঁদা ফান্ড থেকে করার পূর্ব ঘোষণা এবং দাতাদের সম্মতি থাকলে করার অবকাশ আছে। অন্যথায় আবকাশ নেই। (বাদায়ে ৮/৪০৩, ফতহুল কাদীর ৫/৪৫০, আল বাহরুর রায়েক ৫/৩৭৯)

প্রসঙ্গ : কোরবানীর চামড়া

আব্দুল্লাহ

বুখুয়া দারুর রাশাদ মাদরাসা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা : আমাদের গ্রামের সবাই কোরবানীর পশুর চামড়া এক স্থানে জমা করে আসছে এবং গ্রামের কওমী মাদরাসা উহা বিক্রি করে এতিম গরিব ছাত্রদের কাজে ব্যয় করে আসছে। কিন্তু গ্রামের কিছু লোক বলছে, কোরবানীর চামড়া কোনোভাবেই মাদরাসায় দেওয়া যাবে না। বিষয়টি কতটুকু শরীয়তসম্মত?

সমাধান : কোরবানীর পশুর চামড়া, হাড়, মাংস ও চর্বি ইত্যাদির হুকুম এক ও অভিন্ন। ইচ্ছা করলে এগুলোকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে অথবা অন্যকে দিতে পারে। কিন্তু বিক্রি করার অনুমতি নেই। যদি বিক্রি করা হয় তবে মূল্য গরিব-মিসকীনদের সদকা করা ওয়াজিব। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যদি গ্রামের লোকজন তাদের কোরবানীর পশুর চামড়া জমা করে মাদরাসার এতীম ও গরিব ছাত্রদেরকে তার মালিক বানিয়ে দেয় এবং তা বিক্রি করে ছাত্রদের কাজে ব্যয় করা হয়, তবে অবশ্যই শরীয়তসম্মত হবে। উপরন্তু এতীম ও গরিব ছাত্রদেরকে কোরবানীর চামড়া দেওয়ার মাধ্যমে দ্বীনি ইলম অন্বেষণে সহায়তা প্রদান করায় অতিরিক্ত ছাওয়াবের অধিকারী হবে। এ ব্যাপারে কতিপয় লোকদের কথা মোটেও সঠিক নয়। এ ধরনের অনর্থক অমূলক কথাবার্তা থেকে অবশ্যই তাদের বিরত থাকা উচিত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৩৪, হেদায়া ৪/৪৫০)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩